আল্লার রসুল হজরত মহম্মদ

একজন মৌলভী সাহেবের সঙ্গে ইসলাম সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোরাণ এমন জিনিস—রসুল কত পরিষ্কারভাবে সব কথা বলে গেছেন—কারো সঙ্গে কোন বিরোধ নেই, অথচ আমি একটা মুসলমানের মত মুসলমান দেখি না—রসুল কি কখনো একথা বলেছেন যে মুসলমান বা ইসলামপন্থী হ'তে গেলে কারো hereditary culture (বংশানুক্রমিক কৃষ্টি)-কে অস্বীকার করতে হবে? পূর্ব্ববর্ত্তীকে betray (বিশ্বাসঘাতকতা) করে যাকে accept (গ্রহণ) করতে যাই—প্রকৃতপক্ষে তাকেই কি betray করা (ঠকান) হয় না? আমি ইচ্ছা করলেই তো ইসলামের সেবক এই অবস্থায় হতে পারি—প্রত্যেকেই প্রত্যেক অবস্থায় পারে—আর তা উচিতও, কিন্তু conversion (ধর্ম্মান্তর)-এর কথা রসুলের মধ্যে নেই—বরং তিনি পূর্ব্ববর্ত্তীকে কত মান্য দিয়েছেন। রসুলের কথা যারা অমান্য করে তারাই কি কাফের নয়? পরবর্ত্তীদের কথাও হাদীসে আছে—এমন কি এও আছে—তিনি যদি হাবসীদের ক্রীতদাস হন—তবু তাঁকে গ্রহণ করবে। আর ঐ যে খতম—না খাতেমের কি মানের গন্ডগোল আছে? পরবর্ত্তীর কথা যখন আছে তখন রসুলেই সব খতম অর্থাৎ শেষ একথা তো বলা চলে না, বরং continuity (ক্রমাগতি) আছে, এই রকম মনে করাই সমীচীন। অবশ্য পরবর্ত্তী যখন আসেন তখন পূর্ব্ববর্ত্তী খতমই হন—তার কারণ, তিনি তো পূর্ব্ববর্ত্তীর রূপ নিয়ে আসেন না—তবে এটা ঠিক যে সেই একই প্রেরণা বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেন— যিনি যান ঠিক তিনিই আসেন না—কিন্তু যিনি আসেন তিনি তাঁরই continuation (পরবর্ত্তী), তাঁকেই base (ভিত্তি) করে সেই প্রেরণারই further fulfilment (অধিকতর পরিপূরক)।

আ. প্র. ১/৭.১০.১৯৩৯

শ্রীশ্রীঠাকুর এক মৌলভী সাহেবের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন—পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তীদের কথা রসুল কত করে বলে গেছেন। এমন কি বলেছেন শুনেছি, এত prophet (প্রেরিতপুরুষ) আসবেন, যাঁদের সবার নাম দেওয়া সম্ভব নয়। এও নাকি বলেছেন—যে প্রেরিতপুরুষদের মধ্যে প্রভেদ করে এবং একজনকে ছোট করে আর একজনকে বড় করতে চায় সেই কাফের। বাপের হয়ত পাঁচ

ছেলে আছে—তাদের একজনকে বাপের ছেলে বলে সম্মান দিলে—অন্যাদের তার ছেলে বলে স্বীকারই করলে না, এতে বাপকেই কি খাটো করা হলো না? পৌত্রের মধ্যে যদি ঠাকুরদাকে দেখতে না পেলে—তবে ঠাকুরদাকেই দেখা হয়নি। পৌত্রের মধ্যে ঠাকুরদা আছেন—পরবর্ত্তীর মধ্যেও পুর্ব্ববর্ত্তী আছেনই। টিকা-টিপ্পনীই সর্বনাশ করে, সোজা কথাটা ঘুরিয়ে বেঁকা করে ফেলে। আদত জিনিসটা বোঝা যায়। সেখানে কোন গরমিল নেই—ব্যাখ্যার কেরদানিতেই গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। একদল আছে, তারা খোদাকে মানে কিন্তু রসুলকে মানে না—এমন অসম্ভব কথাও মানুষ কয়? হজরত রসুল, হজরত ঈশা, হজরত বুদ্ধের মধ্যে অনেকে আবার পার্থক্য করে—এর চেয়ে ভুল আর নেই। ইহুদীরা যুগের প্রেরিতপুরুষকে মানল না, তাঁকে কত বাধা দিল, তাঁর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল— তাই তারা আজও দুনিয়ার কোথাও স্থান পায় না।

আ. প্র. ১/৭.২.১৯৪০

কয়েকজন মুসলমান ভদ্রলোক পাবনা শহর থেকে এসেছেন। তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার claim (দাবী) কী? Jesus, Mohammad (যীশু, মহম্মদ) সকলেই তো তাঁদের claim (দাবী) জানিয়েছিলেন, আপনার কি তেমন কোন claim (দাবী) আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি claim (দাবী) ক্লেইম বুঝি না—তিনি যা বলান, করান— তাই বলি, করি। আমি হলাম ঢাকের বায়ার মত।

আ. প্র. ১/২৬.৬.১৯৪০

যশোরের একটি দাদা স্থানীয় কয়েকজন মুসলমানের দুর্ব্ব্যবহারের কথা বললেন। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ জোরের সঙ্গে বললেন—ইসলামের অপ্রতিষ্ঠা যাতে হয়, তেমন কিছু করবার সুযোগ মানুষকে দেওয়া তোমাদের উচিত নয়।

আ. প্র. ১/৩০.৩.১৯৪১

হক সাহেব নামে একজন ভদ্রলোক আশ্রমের বিভিন্ন কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলি ঘুরে দেখে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আপনার কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলি দেখে আসলাম। বেশ সুন্দর! তবে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে এত কর্ম্মের আয়োজন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম মানে আমি বুঝি তাই করা যাতে আমাদের বাঁচাবাড়া অক্ষুণ্ণ থাকে। এর জন্য গোড়ায় চাই ঐ রসুল বা কামেল পীর, তাঁকে ভালবেসে, তাঁকে অনুসরণ করে আমরা যখন চলি, তখন দুনিয়ার হাজারো রকম টান আমাদের আর বিচ্ছিন্ন করতে পারে না, আমরা বিভ্রান্ত হই না। ঐ খোঁটা ঠিক রেখে বাঁচার জন্য, বাড়ার জন্য যা যা করি, সবই তখন ধর্ম্ম হয়ে দাঁড়াবে। বরং বাঁচা-বাড়ার জন্য যা যা করণীয়, তার কোনটা যদি বাদ দিই, তাহলে আমাদের জীবন ততখানি ধর্ম্মচ্যুত হয়ে পড়বে, অর্থাৎ বাঁচা-বাড়ার থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। আবার পরিবেশকে না বাঁচিয়ে আমরা বাঁচতে পারি না। আমাদের কর্ম্মের ভিতর দিয়ে, সেবার ভিতর দিয়ে পরিবেশকে যতখানি উন্নত ক'রে তুলতে পারব, পরিবেশের উন্নততর কর্ম্ম ও সেবার ভিতর দিয়ে আমরাও তত সুষ্ঠুভাবে সম্বর্দ্ধিত হব। তাই দেখেন, ধর্ম্মের মধ্যে কর্ম্মের প্রয়োজন কতখানি, তবে সব কর্ম্ম সার্থক হয়ে ওঠা চাই খোদাতালায়, রসুলে। ....

হকসাহেব—আপনি রসুলের কথা বলছেন, হিন্দুর মুখে রসুলের কথা তো বড় একটা শুনি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খোদার প্রেরিত যিনি, তিনি সবারই আপনজন। তিনি হিন্দু-মুসলমান সকলেরই, সর্ব্বমানবেরই। এই রসুলকে বাদ দিয়ে আমরা খোদাতালায় পৌঁছাতে পারি না। আবার রসুল বলেছেন—আমরা যদি প্রেরিতপুরুষদের কাউকে স্বীকার করি, কাউকে অস্বীকার করি, কাউকে ছোট করে কাউকে বড় করি, তাহলে সেটা কাফেরত্বেরই সামিল। আবার ঈশ্বর-বিশ্বাসী, অটুট ইষ্টপ্রাণ কাউকে যদি কেউ কাফের বলে, সেও তার ভিতর দিয়ে নিজের কাফেরত্বেরই পরিচয় দেয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ধার্ম্মিক কখনও কাফের নয়, আবার কাফের কখনও ধার্ম্মিক নয়। খাঁটি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টানে কোন প্রভেদ নেই, তারা সবাই একপন্থী। প্রত্যেকেরই উচিত প্রত্যেকটি প্রেরিতপুরুষকে শ্রদ্ধা করা। এর ভেতর দিয়েই পারস্পরিক সম্প্রীতি সহজ হয়ে ওঠে। ধর্ম্মের বিকৃতি যাতে না হয়, সেদিকে আমাদের সমবেত লক্ষ্য রাখা উচিত। রসুলের কোন বাণীর কদর্থ যাতে কেউ না করে, সেদিকে আপনারও যেমন লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, আমারও তেমনি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। প্রত্যেক মহাপুরুষ সম্বন্ধে প্রত্যেকের এই মনোভাব থাকা উচিত। আমরা পরস্পরকে যত জানি ও শ্রদ্ধা করি ততই লাভবান হই। যতই অনুধাবন করি ততই বোধ করতে পারি—

খোদা এক, তাঁর প্রেরিতপুরুষগণ এক বার্ত্তাবাহী এবং ধর্ম্ম অর্থাৎ জীবন-বৃদ্ধির নীতিও একই।

হক সাহেব—ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম্মে তো অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মূলগত পার্থক্য কমই পাবেন। তবে দেশ-কাল-পাত্রানুগ বৈশিষ্ট্যানুযায়ী খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার বিধান থাকতে পারে। এবং আমার তো মনে হয় সেটা ঐক্যেরই নিদর্শন। কারণ, প্রত্যেক প্রেরিত-পুরুষই বৈশিষ্ট্যপূরণী। এই বৈশিষ্ট্যপূরণের দিক দিয়ে সবার মধ্যে ঐক্য আছে। বৈশিষ্ট্য যেখানে বিচিত্র, সেখানে বৈশিষ্ট্যপূরণী ব্যাপারে বৈচিত্র্যের অভিব্যক্তি থাকবেই। কিন্তু সবটার মূল লক্ষ্য ঈশ্বরমুখী জীবনবৃদ্ধি। আর প্রেরিতপুরুষদের মধ্যে পাবেন পূর্ব্বতনের আপূরণ। 'স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।' পরবর্ত্তী পূর্ব্বতনদেরই সংহতমূর্ত্তী। পূর্ব্বতনদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ নাই, বরং তাঁর মধ্যে আছে সবার পরিপূরণ।

হকসাহেব—মূলগত বিষয়ে যে পার্থক্য নেই, তাই বা বলা যায় কী করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরুন, ইসলাম শব্দের মানে আমি শুনেছি, খোদায় আত্মনিবেদন বা শান্তি। সব ধর্ম্মেরই তো মূলকথা এই। সব ধর্ম্ম বললে কথাটা ভুল বলা হয়, কারণ ধর্ম্ম বহু নয়, ধর্ম্ম একই। আর কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত এই পাঁচটি অনুষ্ঠান শুনেছি, মুসলমানদের অবশ্যকরণীয়। প্রত্যেক শাস্ত্রেই তো এই বিধান আছে, তবে হয়ত ভিন্ন ভাষায়, ভিন্ন নামে হতে পারে। কলেমা মানে আমি বুঝি, খোদাতালায় বিশ্বাস রেখে প্রেরিত-পুরুষকে স্বীকার করে তাঁর অনুশাসনে চলা। এই বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও অনুসরণ ধর্ম্মের প্রথম ভিত্তি। হিন্দুর মধ্যেও আছে যুগপুরুষোত্তম বা সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে তাঁকে অনুসরণ করে চলার কথা। খ্রীষ্টানদের মধ্যেও আছে baptism (অভিষেক)-এর প্রথা। বৌদ্ধরাও আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রিশরণ-মন্ত্র গ্রহণ করে থাকে বলে শুনেছি। এই স্বীকৃতি, এই পুরুষশ্রেষ্ঠকে আপন করে নেওয়ার মধ্য দিয়েই তাঁর অনুবর্ত্তনে চলার পক্ষে সুবিধা হয়। আর নামাজ মানে সন্ধ্যা, বন্দনা, প্রার্থনা। মানুষ ইষ্টের স্মরণ, মনন যত করে, তত তার মন পবিত্র হয়ে ওঠে, প্রবৃত্তিগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার কায়দা পায়, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসমীক্ষণে পটু হয়, তাছাড়া এতে করে ইষ্টচলনের সম্বেগ বাড়ে, তাই এ নির্দ্দেশও সর্ব্বত্র আছে। আর রোজা মানে ইষ্টচিন্তাপরায়ণ হয়ে সুনিয়ন্ত্রিত উপবাস, এতে শরীর মনের অনেক গলদ বেরিয়ে যায়, ইচ্ছাশক্তি প্রবল হয়ে ওঠে। শুনেছি

বিধিমাফিক উপবাস কাম-দমনের পক্ষেও সহায়ক। এও সবারই করণীয়, যে যে-পথেই চলুক। হজ মানে তীর্থযাত্রা, ভাবসিক্ত হয়ে তীর্থ-দর্শন করলে আমরা সাধু-মহাপুরুষদের ভাবে অনুপ্রাণিত ও অভিষিক্ত হয়ে উঠি। এ বিধানও সবার মধ্যে আছে। আর জাকাত মানে ধর্ম্মার্থে দান, ইষ্টার্থে উৎসর্গ। এই বাস্তব করণের ভিতর দিয়ে ইষ্টের প্রতি আমাদের অনুরাগ বাড়ে, তাছাড়া আমাদের উদরান্ন-আহরণী কর্ম্মও ইষ্টসার্থকতায় সার্থক হয়ে উঠতে থাকে; এইভাবে ইষ্ট আমাদের সব-কিছুতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে ওঠেন। সংসারে চলতে আমাদের হাজারো তাল নিয়ে চলতে হবে, কিন্তু সবটার মধ্যে যদি ইষ্টকে স্থাপনা করতে পারি, তাহলেই আমরা বহু অনিষ্ট, বিপদ, আপদ ও অনর্থের হাত হতে রেহাই পেতে পারি। আপনাদের যেমন জাকাত আছে, তেমনি অন্যত্র আছে ইষ্টভৃতি। এই ইষ্টভৃতি যে কত বড় জিনিস, মানুষের কত বড় রক্ষা-কবচ তা করলেই বোঝা যায়। আবার এত ভেতর দিয়ে দুঃস্থ পরিবেশও প্রভৃত উপকৃত হয়। তাহলেই দেখুন, মূল জিনিসগুলি সর্ব্বত্র সমান কিনা।

হকসাহেব—পুনর্জ্জন্ম জিনিসটা কি আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা রোজ-কিয়ামৎ যেটাকে কন, আমার মনে হয়, সেটা পুনর্জ্জন্মেরই নামান্তর। মানুষ যেমনতর ভাব নিয়ে যায়, তেমনতর ভাব নিয়ে স্ত্রী-পুরুষ যেখানে যখন মিলিত হয়, সেখানে তখন তার পুনরাগমনের সম্ভাবনা হয়। পুনরায় শরীরে কায়াম হওয়ার এই যে রীতি, একেই বোধ হয় বলা হয়েছে রোজ-কিয়ামৎ। আমি অবশ্য কোরাণ-টোরাণ পড়িনি, মুখ্যু মানুষ, কি বলতে কি কই। তবে আমার যেমন মাথায় আসে তা এই। শুনেছি পুনর্জ্জন্মের কথা কোরাণেও আছে।

হক সাহেব—শুনতে পাই আপনি নাকি নূর ও আওয়াজ অনুভব করেছেন, আমাদের পক্ষেও কি তা অনুভব করা সম্ভব? আর ঐ অনুভূতিতে লাভ কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লাভ-লোকসানের ধারণা নিয়ে আমি কোনদিন কিছু করিনি। নাম করতে খুব ভাল লাগতো, আর আপন আনন্দে নাম করতাম। নাম না করেই যেন পারি না। কি পাব, কি হবে এসব কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু একটা আকুল নেশা ছিল। গভীরে আরো গভীরে চলে যেতাম। এই অনুশীলনের পথে কত কি-ই দেখা যায়, শোনা যায়, সে এক অপরূপ জগৎ। তবে অনুরাগই এর মূল বস্তু। অনুরাগযুক্ত অনুশীলনে আমাদের মস্তিষ্ক-কোষগুলির মধ্যে যতই

দহনতাপের সৃষ্টি হয়, ততই শব্দ ও আলো অনুভব করা যায়, এর মধ্য দিয়ে আমাদের সাড়াশীলতা ও গ্রহণক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। জগতের যা-কিছুকে তখন তীক্ষ্ণভাবে বোধ করা যায়। এই বোধগুলি যতই আবার ইষ্টসূত্রে গ্রথিত ও সমাহিত হয়ে ওঠে, ততই সমাহারী প্রজ্ঞার আবির্ভাব হয়। আমি যা-কিছু বলি তা কিন্তু আমার বোধের উপর দাঁড়িয়ে। আমি কোন বই-টই পড়িনি। কিন্তু নিজের জীবনে যা অনুভব করেছি, সেই দাঁড়ায় ফেলে সব-কিছুর মূল স্পন্দনটা যেন ঠাহর করতে পারি। আপনি করুন, আপনারও হবে। আমান দেখেছেন, আমান অনুভব করেছেন, রসুল-সেবী, আল্লা-অনুরক্ত এমন একজন পুরুষকে যদি পান তাঁর শরণাপন্ন হন, তাঁকে কেন্দ্র করে রসুল আপনার জীবনে জীবন্ত হয়ে উঠবেন। আপনাদেরও তো শুনেছি, মারেফতী সাধনার কথা আছে।

হকসাহেব—মুসলমানের মধ্যে যদি এমন সিদ্ধ-পুরুষ না পাই, তিনি যদি অন্য সম্প্রদায়ের হন তাহলে তাঁকে কি গ্রহণ করা চলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি যে সম্প্রদায়ের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাঁর যদি রসুলে অনুরাগ থাকে এবং রসুলের প্রতি আপনার অনুরাগকে সঞ্জীবিত করে তুলতে পারেন, আপনার ভাবে তিনি যদি ব্যাঘাত না করেন, তাহলে আপনার অসুবিধা কোথায়? দীক্ষা এক জিনিস আর ধর্ম্মান্তরগ্রহণ অন্য জিনিস। ধর্ম্মজীবন যাপন করতে যেয়ে পিতৃপুরুষকে ও পিতৃকৃষ্টিকে যদি অস্বীকার করতে হয়, তবে সে তো একরকমের বিশ্বাসঘাতকতা। শুনেছি বিদায়-হজে রসলু এর বিরুদ্ধে তীব্রভাবে বলেছেন।

হকসাহেব—কোরাণের মতে রসুল তো শেষ নবী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তদানীন্তন কালের মত তো তিনি সর্ব্বশেষ নবী, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? হাদীসে তো শুনেছি, পরবর্ত্তীকে মানার কথা বিশেষভাবে লেখা আছে, এমন কি তিনি যদি হাবসী ক্রীতদাসও হন। আবার হাদীসে নাকি এই ধরনের কথা আছে, 'প্রেরিত এসেছিলেন, প্রেরিত আসবেন, প্রেরিত জয়যুক্ত হবেন—ইহাই ঈশ্বরের চিরন্তন নিয়ম ও বিধি।' কোরাণে এমনতর কথা আছে যে, ঈশ্বরের নিয়ম ও নীতির পরিবর্ত্তন হয় না। যে নিয়মের ভিতর দিয়ে যে প্রয়োজনে একদিন রসুলের আবির্ভাব হয়েছিল, সেই নিয়মের ভিতর দিয়ে অনুরূপ প্রয়োজনে আবার যে অনুরূপ আবির্ভাব হতে পারে না তা মনে হয় না। এগুলি আমার মোটাবুদ্ধির কথা। আমি তো আরবী-টারবী জানি না, যারা আরবী জানেন, তাদের কারও কারও মুখে শুনেছি, আরবী ভাষার যে

কথাটির অর্থ করা হয় শেষ নবী বলে, তার আর-একটা পাঠ হতে পারে, এবং তার মানে নাকি দাঁড়ায়, তিনি নবীদের মধ্যে মণিস্বরূপ। সে কথা তো ঠিক কথা, রসুলের যে অপূর্ব্ব জীবন, তাতে তিনি নবীদের মধ্যে মণিস্বরূপ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? আর এও যেন শুনেছি মনে হয়, তিনি নবীদের শীলমোহর স্বরূপ। অর্থাৎ তিনি হলেন একজন আদর্শ নবী, তাঁর মানদণ্ডে আমরা বিচার করতে পারি, কেউ প্রকৃত নবী কিনা। এ সবই কিন্তু আমার শোনা কথা, আমি ভুলও শুনে থাকতে পারি। যা যা শুনেছি, তা যদি সত্যি হয়, তার সঙ্গতি কোথায়, যেমনটা ভেবেছি তাই বলছি। যাই হ'ন, রসুল আমাদের অতিপ্রিয় এবং রসুল-প্রেমী যে সেও আমাদের অত্যন্ত প্রিয়। মানুষ যুগে-যুগে এই প্রেমী-মানুষকেই খোঁজে। তাঁকে না পেলে মানুষের পেট ভরে না। বই-পুঁথিপত্রে তো কত কথা আছে, কিন্তু তা তো আমাদের তেমনভাবে নাড়া দিতে পারে না, যেমন করে দেয় ঐ প্রেমীর ব্যক্ত জীবন। ....

আ. প্র. ২/২৪.১২.১৯৪১

কথাপ্রসঙ্গে একটি মুসলমান ভাইকে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন— তুমি কোরাণ পড়েছ?

তিনি বললেন—মূল পড়িনি, অনুবাদ পড়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—কোরাণ খুব ভাল করে পড়ো। কোরাণ পড়া খুব ভাল। পারলে রোজ পড়া ভাল। যা আচরণ করতে হবে, তা দু-চার বার পড়ে রেখে দিলে হয় না। নিত্য-চর্চা করতে হয়। না-হলে বিস্মৃতি আসে। ভাবটাও তর্‌তরে থাকে না। আরবী শেখা ভাল, যাতে মূল কোরাণ পড়ে বুঝতে পার। Translation-এ (অনুবাদে) মূলের সবটুকু পাওয়া যায় কমই।.......

এরপর...ব্যক্তিগত ও কুলগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৈশিষ্ট্যের কথা রসুলও বিশেষ করে বলেছেন বলে শুনেছি।

উক্ত ভাই—তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের বিশেষভাবে প্রশংসা করেছেন। একজায়গায় বলেছেন—কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গেলে, তার, তার পিতার এবং বংশের পরিচয় নেওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরো অনেক কথা আছে বলে শুনেছি।

উক্ত ভাই—হজরত একজায়গায় বলেছেন—তুমি আল্লার জন্যই লোককে ভালবাসবে এবং আল্লার জন্যই লোকের সঙ্গে শত্রুতা করবে। আমি এমনিই

যদি লোককে ভালবাসি, তাতে দোষ কী, আর আল্লার জন্য লোকের সঙ্গে শত্রুতা করতে হবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—ও কথা বিলকুল ঠিক আছে। মানুষের উপর যে প্রীতি, তা যদি আল্লার জন্য না হয়, তা হলে তার নিরীখ ঠিক থাকবে না। সে প্রীতি তখন মোহের রূপ ধরে উভয়কেই মূঢ় ও সঙ্কীর্ণ করে তুলতে পারে। কিন্তু আল্লার জন্য যে পারস্পরিক প্রীতি তার মধ্যে আবিলতা, মূঢ়তা বা সঙ্কীর্ণতার স্থান নেই। শুধু এই ব্যাপারে নয়, আল্লাকে বাদ দিয়ে যাই করতে যাওয়া যাক্, সেইখানেই মানুষ প্রবৃত্তির কবলে পড়ে যায়, balance (সমতা) হারিয়ে ফেলে, সত্তা-সম্বর্দ্ধনী সঙ্গতি ঠিক রাখতে পারে না, ভাল করতে যেয়েও মন্দ করে ফেলে, উন্মার্গগামী হয়ে পড়ে। রসুলকে বাদ দিয়ে কিন্তু আল্লার সন্ধান পাওয়া যায় না, তাই রসুল-প্রীতি চাই-ই। আর আল্লার জন্য মানুষের সঙ্গে শত্রুতা করা মানে, আল্লার ব্যাপারে কারও সঙ্গে কোন আপোষরফা না করা। আল্লার বিরোধী যদি কেউ হয়, রসুলের বিরোধী যদি কেউ হয়, ধর্ম্মের বিরোধী যদি কেউ হয়, তাহলে গোঁজামিল দিয়ে তার সঙ্গে মিল করা চলে না। ঐ মিল করা মানে, নিজের নিষ্ঠাকে পদদলিত করে চলা। হয় তাকে পরিবর্ত্তন করতে হবে, নয় তার থেকে স্বতন্ত্র থাকতে হবে। অধর্ম্মের বিরুদ্ধে ধর্ম্মের জেহাদ চিরকালই। সৎ চাইব, অথচ অসৎ-এর নিরোধ করব না, এ হয় না। তথাকথিত উদারতার থেকে নিষ্ঠার কঠোরতা ঢের ভাল। নচেৎ নিজেকে টিকিয়ে রাখাই কঠিন। ওতে আস্তে আস্তে মানুষ অন্যদিকে ঢলে পড়ে। তবে আমরা কারও সঙ্গে শত্রুতা করতে যাব না। ধর্ম্মের সঙ্গে অর্থাৎ সত্তাপোষণী ধৃতিচর্য্যার সঙ্গে শত্রুতা যাদের, তাদের আমরা চিনে রাখব, এবং তারা যাতে ঐ অপকর্ম্ম করে অন্যকে বিপন্ন করতে না পারে, যে বিষয়েও আমরা সজাগ ও সক্রিয় থাকব। সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করব তাদের যদি ফেরাতে পারি।

প্রশ্ন—রসুল বলেছেন, যে-ব্যক্তি বা জাতি সব চাইতে শক্তিমান হ'তে চায়, সে যেন আল্লার উপর নির্ভর করে। কিন্তু আল্লার উপর নির্ভর করে কেউ যদি নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থাকে, তাহলে কি তার উন্নতি হবে? অনেকে নির্ভরতার সুফলের কথা শুনে নির্ভর করে থাকে, কিন্তু তাদের তো ভাল হয় ব'লে মনে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আল্লার উপর নির্ভর করা মানে ব'সে থাকা নয়। আল্লার শাশ্বত নীতিবিধিকে পালন করে চলা, ভরণ করে চলা—যে-ব্যাপারে যা করতে

হয়। জাগতিক শক্তিসম্পদ লাভ করার জন্য মানুষ আশুলাভের আশায় অনেক সময় আল্লার অনুমোদিত পন্থা বিস্মৃত হয়ে নানা অসৎ পন্থা আশ্রয় করে থাকে। কিন্তু এই সব অবৈধ চলনের উপর যা'রা নির্ভর করে, তারা কখনও প্রকৃত শক্তিসম্পদের অধিকারী হতে পারে না। কারণ, তাদের যোগ্যতাই বাড়ে না। নির্ভর করার সঙ্গে নিশ্চেষ্ট থাকার কোন সম্বন্ধ নেই। নির্ভর কথার মধ্যেই আছে নিঃশেষে ভরণ। তবে এর অন্য একটা দিক্ আছে, যেমন স্ত্রী স্বামীর সংসার নিয়েই সর্ব্বক্ষণ ব্যাপৃত, নিজের কথা ভাববারও তার অবকাশ নেই, তাই তার পালন-পোষণ স্বামীরই স্বতঃ-কর্ত্তব্য হ'য়ে পড়ে। কিন্তু স্বামী যেখানে তা পেরে ওঠে না, সেখানেও অনুগত স্ত্রীর কোন অনুযোগ বা দাবী-দাওয়া থাকে না। বরং প্রয়োজন হ'লে সে-ই স্বামীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়ে কোমর বেঁধে দাঁড়ায়। প্রেমের লক্ষণই হ'লো প্রেমাস্পদকে কষ্ট পেতে না দেওয়া, নিজে সব ঝুঁকি নিয়ে তাকে স্বস্তি দেওয়া। আমি বসে থাকলে আল্লা যদি সব করেও দেন, তাও তাঁকে খাটাতে যাব কেন? আমাকে তো তিনি সব শক্তি দিয়েছেন, আমিই করব, আমিই খাটব। আর কৃতার্থতার উপঢৌকন তাঁকে দিয়ে বলব—এই তোমার দয়ার দান তুমিই গ্রহণ কর।.....

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে মোস্তাফাচরিত-এর একটা অংশ পড়ে শোনাতে বললেন। কেষ্টদা পড়লেন। পড়া শেষ হলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কোথায় লাগে সাম্যবাদ এর কাছে? সমষ্টির উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যানুযায়ী প্রতিটি ব্যাষ্টির উন্নতি একসঙ্গে বাঁধা। ধর্ম্ম মানেই এমনতর।

আ. প্র. ৬/২০.৩.১৯৪৫

রাজসাহী-বিভাগের সহকারী সেলট্যাক্স-কমিশনার খান-বাহাদুর এ, হক..... আশ্রম পরিদর্শনান্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসেছেন। কথাপ্রসঙ্গে মিঃ হক্ বললেন— আমার মনে হয়, মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয়—সে মানুষ। ধর্ম্ম মানুষেরই জন্য। জগতে বহু ধর্ম্মমত থাকতে পারে, সে বৈচিত্র্য বিধাতারই নিয়ম। কিন্তু সমস্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্র যদি ঘাঁটা যায়, তাহ'লে আমরা দেখতে পাব, সব জায়গায় আছে এক কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! সে তো ঠিক কথা। তাই তো একে বলে বিজ্ঞান। ঈশ্বর এক, ধর্ম্ম এক, প্রেরিতপুরুষরাও একই সত্যের উদ্গাতা। ধর্ম্মের দুটো দিক আছে—একটা divine (ভাগবত) আর একটা discrete (বৈশিষ্ট্যসম্মত)।

Divine (ভাগবত) যা, তার কোন পরিবর্ত্তন নেই, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে তা এক। কিন্তু অন্যটার বেলায় তা নয়—যেমন, কোনস্থানে হয়তো লঙ্কা বেশী খাওয়া জীবনের জন্য প্রয়োজন, কারও স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ অবস্থায় হয়তো একটু মদ দরকার। তাই দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বাঁচাবাড়ার স্বার্থে discrete-এর (বিশিষ্টতার) বৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী।

মিঃ হক্—আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগে—খোদাতালা কি আমাদের স্তুতি চান? তিনি যদি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বগুণের আধার, তবে এটা কেমন কথা যে তিনি মানুষের মুখে নিজের গুণগান শোনার জন্য এত ব্যাকুল!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি চান না, আমরা চাই; আর এতে আমরাই লাভবান হই। আমরা যতই তাঁর গুণমুগ্ধ হই, তাঁর স্তুতি করি, ততই তাঁর গুণগুলি আমাদের মধ্যে উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে। আমাদের এই বিবর্ত্তনটা তিনি চান। তাই তিনি যদি আমাদের স্তুতি চান, সেও আমাদের মঙ্গলের জন্য। এতে তাঁরও সুখ, আমাদেরও সুখ। দেখেননি, নিন্দুক যারা, তারা মানুষের কু ছাড়া দেখে না, কয় না। তারা নিজেরাও দুষ্ট হয়, সমাজকেও দূষিত করে। আবার অনেকে আছে তারা মানুষের সু দেখে এবং সুখ্যাতি ছড়ায়। তারা নিজেরাও সুখী হয়, পরিপার্শ্বিককেও সুখী করে।

মিঃ হক্—মুখে বার-বার বললে, প্রার্থনা করলে কী হবে? বিশেষতঃ আমাদের আরবীভাষার পদগুলির অর্থই তো অনেকে বোঝে না। এমনতর আওড়ানিতে কি কোন ফল হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী।' আবৃত্তি চালাতে থাকলে ধীরে-ধীরে বোধও ফুটে ওঠে। ওগুলি বাদ দিতে নেই— অবশ্য অর্থের ব্যুৎপত্তি না হলে চলা, করা ঠিক-ঠিক ফুটে ওঠে না। প্রার্থনা মানে, করার ভিতর দিয়ে প্রকৃষ্টভাবে কোন-কিছু অধিগত বা আয়ত্ত করা। যেটাকে প্রার্থনা বলেন, ওটা হ'লো auto-suggestion (স্বতঃ অনুজ্ঞা) বিশেষ। প্রার্থনার মধ্যে আছে বাস্তব করা। প্রার্থনা হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা যা করি, ওটা প্রার্থনানুযায়ী চলার পূর্ব্বকৃতি। প্রার্থনানুকূল কর্ম্মের সম্বেগ এতে গজিয়ে ওঠে। মৌখিক বলাটাই সব নয়। করার ভিতর-দিয়ে আয়ত্ত করাটাই প্রার্থনা।......

মিঃ হক্—ক্রিয়া-সম্বন্ধে আপনার মত কি? ক্রিয়াগুলি না করলে কি হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—ভাত-রান্নার একটা ক্রিয়া আছে। সেই ক্রিয়াগুলি যথাযথভাবে করলে তবে ভাত রান্না হয়, তা না করলে ভাত রান্না হয় না। যে

উদ্দেশ্যে যে ক্রিয়ার নির্দ্দেশ দেওয়া আছে, সেই ক্রিয়া না করলে সে উদ্দেশ্যে যে সিদ্ধ হবে না— এই তো বিধি।.......

*　　　　*　　　　*

মিঃ হক্—হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা আমি খুব ভাবি। মানব-মিলনের এই আদর্শ বৃহত্তর সমাজে বাস্তব হয়ে ওঠা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুই-এক লাখ হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, পারশী, সাঁওতাল, গারো, নাগা, বার্ম্মিজ, গুর্খা, শিখ মায় চিনেম্যান পর্য্যন্ত যারা এখানকার ভাবে ভাবিত হয়েছে, তাদের মধ্যে এটা গজিয়ে উঠছে।

আ. প্র. ৬/৮.৫.১৯৪৫

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পুরুষোত্তম যখন আসেন, তখন যে যে-মতেরই হোক, যে যে-পথেরই হোক, সবারই তাঁকে ধরা লাগে। তিনি হলেন মিলন-তীর্থ, তিনি হলেন পূরণ-বেদী। যে-কেউ যে-কোন অবস্থায় তাঁর দেওয়া নাম নিতে পারে, তাতে কোন দোষ হয় না। তাতে গুরুত্যাগ হয় না। দল রাখার জন্য গুরুত্যাগের ভয় দেখায়, দল তো রাখতে হবে। শুধু হিন্দু বলে নয়, সব সম্প্রদায়ের লোকেরই তিনি উপাস্য। আমি যদি রসুলের ভক্ত হই, তবে রসুল যাঁদের ভালবাসেন, নতি জানান, তাঁদের অস্বীকার করি কেমন করে? কোরাণে আছে, যে প্রেরিতগণের মধ্যে বিভেদ করে এবং কোন প্রেরিতের প্রতি বিদ্রোহী হয়, সে কাফের। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রশ্রয় দেওয়া মানে কাফেরত্ব বা পাতিত্য কবুল করা—যে-ই তা করুক না কেন। আগে মুসলমান পীরের কত হিন্দু শিষ্য থাকত, হিন্দু সাধুর কত মুসলমান শিষ্য থাকত। এতে হিন্দুরও মুসলমান হওয়া লাগত না, মুসলমানেরও হিন্দু হওয়া লাগত না। বিদায় হজে হজরত বলে গেছেন—যে নিজের বংশের পরিবর্ত্তে নিজেকে অন্য বংশের বলে প্রচার করে, তার উপর আল্লার, তাঁর ফেরেস্তাদের এবং সমগ্র মানবজাতির অনন্ত অভিসম্পাত। ধর্ম্মের নামে এই অপকর্ম্ম চলছে। যা মানুষকে বাঁচাবে, পথ দেখাবে, তাকেই যদি এমন বিকৃত করে তুলি, তাহলে আমাদের উপায় হবে কী? ধর্ম্মের এই দুঃস্থ, বিকলাঙ্গ চেহারা দেখে মানুষ ধর্ম্মের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে।..... এই অবস্থা ঘোচান লাগবে। ধর্ম্মের সুস্থ, স্বাভাবিক রূপ ফুটিয়ে তুলতে হবে আচরণে ও জীবনে। তখন ধর্ম্মের সঙ্গে লড়ে কে, দেখা যাবে।

আ. প্র. ৬/২৬.১২.১৯৪৫

একটি মুসলমান ভাই আল্লার স্বরূপ-সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আল্লা মানে অল্ লা—সবকে যিনি গ্রহণ করেন। প্রেমের স্বভাবই হলো সবাইকে আপন করে নেওয়া। কৃষ্ণ মানে যিনি আকর্ষণ করেন। ঐ একই কথা। রসুলও কৃষ্ণ। তিনি চেয়েছেন মানুষকে আল্লার দিকে আকৃষ্ট করতে। ঐ তাঁর একমাত্র কারবার। সেইজন্য রসুল ছাড়া পথ নেই। বাইবেলে আছে—I am the way, the truth, the life—no one can come to the Father except through me. (আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন, আমার ভিতর দিয়ে ছাড়া কেউ পরমপিতার কাছে যেতে পারে না।) পয়গম্বরকে বাদ দিয়ে যে আল্লার কাছে পৌঁছান যায় না, এমনতর কথা ইসলাম-শাস্ত্রেও আছে। দয়াকে পেতে গেলে দয়াবান ছাড়া পথ নেই। আবার পীর হলেন রসুলের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেনেওয়ালা। নামকাওয়াস্তে পীর হলে হবে না, চাই কামেল-পীর, যাঁকে বলে আচার্য্য—যিনি আচরণ করে জেনেছেন।

আ. প্র. ৬/২৬.১২.১৯৪০

আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন— তোমরা সেই দেশের মানুষ যাদের মানুষ ভাবতো— পৃথিবীর গুরু। ভারতের নাম শুনলে একদিন সারা পৃথিবী নমস্কার করতো। আমরা সে-সব কথা ভুলে গেছি। ভুলতে শেখান হয়েছে। ফলকথা, আমাদের বৈশিষ্ট্য কী, তাই আমরা জানি না। শিক্ষা জিনিসটা যখন বৈশিষ্ট্যকে অবহেলা করে, তখন সে শয়তানকে আমন্ত্রণ করে। আমি শুধু ভারতের কথাই বলছি না, এটা সব দেশের পক্ষেই সত্য। আবার, দেশপ্রেম যতই থাকুক না কেন, আদেশ-প্রেম না থাকলে তা কিছুই নয়, তাই common Ideal- এ (এক আদর্শে) অনুপ্রাণিত হতে হবে। এর ভিতর-দিয়ে আসবে ঐক্য। এমনকি, সাম্প্রদায়িক বিরোধেরও মীমাংসা হবে ওর ভিতর-দিয়ে। কারণ, প্রকৃত আদর্শপুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তীদের পরিপূরণই করে থাকেন। Christ (যীশুখ্রীষ্ট) তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তীদের কত অভিবাদন জানিয়েছেন। হজরত রসুলও পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষদের কত অভিবাদন জানিয়েছেন। ঋগ্বেদের মধ্যে দেখতে পাই, 'পূর্ব্বেভিঃ প্রথমেভিঃ' ইত্যাদি। তাঁরা আটলান্টিকেই থাকুন, এভারেস্টের চুড়োয়ই থাকুন, সাহারার মরুভূমিতেই থাকুন আর সুন্দরবনের জঙ্গলেই থাকুন, সব জায়গা থেকে এক কথাই বলেন। একে বলে বিজ্ঞান,

সর্ব্বত্র একই data (তথ্য)। যে-কোন Prophet (পয়গম্বর)-কে অস্বীকার করা মানে, খোদাকে এবং অন্যান্য Prophet (পয়গম্বর)-দেরও অস্বীকার করা। আবার, পূর্ব্বতনে শ্রদ্ধানতি নিয়ে বর্ত্তমানকে স্বীকার করা মানেই তাঁর মধ্যে সবাইকে পাওয়া। তাই বলে, 'সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ', 'স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।' তাঁরা আবার শুধু collective programme (সমষ্টিগত কর্ম্ম-পদ্ধতি) দেন না, প্রত্যেকটা individual-এর (ব্যষ্টির) জন্য দেন, তাও বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী। আজ যদি রসুলের ভোট নাও, তাঁর for-এ (অনুকূলে) যত ভোট পাবে, অতো ভোট চার্চ্চিল পাবে না। এটা আমি বলছি, তাঁরা মানুষের কাছে কত বরণীয় সেটুকু বোঝাবার জন্য।

প্রশ্ন—বহুধর্ম্মে কামড়াকামড়ি—এর সমন্বয় কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রেরিত বা অবতারপুরুষদের প্রত্যেককেই মান্য করতে হবে, এঁদের মধ্যে বিভেদমূলক বিচার করলে হবে না, আবার পূর্ব্বতন প্রত্যেককে স্বীকার করেন ও পরিপূরণ করেন এমনতর বর্ত্তমান মহাপুরুষ যদি কেউ থাকেন, তাঁতে শ্রদ্ধানত হতে হবে। এতে আলাদা-আলাদা সম্প্রদায় থেকেও সাম্প্রদায়িক বিরোধ থাকবে না। ঈশ্বর এক, ধর্ম্মও এক, অবতার-মহাপুরুষরাও এক, সমন্বয় হয়েই আছে। চাই শুধু সেইটে ধরিয়ে দেওয়া।

প্রশ্ন—পৌত্তলিকতা কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা কোন-না-কোন রকমে এসে ঢুকে পড়ে। কিন্তু দেখতে হবে ওর মূল। খ্রীষ্টভক্তেরা যেমন cross-এর (ক্রুশের) পূজা করে, সেই cross (ক্রুশ পূজার কোন মানে নেই যার পিছনে Christ (যীশুখ্রীষ্ট) নেই। তা আমরা ত্যাগ করতে পারি না—যার পিছনে আছে পবিত্র স্মৃতি এবং sentiment (ভাবানুকম্পিতা)। পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতি নিজেদের ভিতর জাগ্রত রাখবার জন্য তাঁদেরও তো মানুষ পূজা করে, কিন্তু পৌত্তলিকতা বলে যদি সেটা বাদ দেয়, তাহলে কতখানি বঞ্চিত হয়!

প্রশ্নকর্ত্তা—হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান তো দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মিলও দিনের পর দিন বেড়েই চলে। যে প্রকৃত হিন্দু সেই প্রকৃত মুসলমান। সত্যিকার ধার্ম্মিক সব ধর্ম্মের সমান। হিন্দুর ঈশ্বর আর মুসলমানের ঈশ্বর কি আলাদা? আমাদের এখানে এক মুসলমান পীরের কত হিন্দু-শিষ্য ছিল, তাদের তো জাত যায়নি! হজরত রসুলের স্পষ্ট নিষেধ সত্ত্বেও

হজরত রসুলকে স্বীকার করার বেলায় পূর্ব্বপুরুষকে অস্বীকার করার প্রথা প্রবর্ত্তন করায় হজরত রসুল hampered (ব্যাহত) হয়েছেন ঘরে-ঘরে। ধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মবিগ্রহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধরে আসেন। দ্বিতীয়ার চাঁদও চাঁদ, তৃতীয়ার চাঁদও চাঁদ, কিন্তু দ্বিতীয়ার চাঁদ বাতিল করে তৃতীয়ার চাঁদ নয়।......

প্রশ্ন—কোরাণে তো আছে 'খাতেম উল নবীন'—তা থেকে তো এ বোঝা যায় না যে তিনি শেষ-প্রেরিত। খাতেমের অন্য মানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খাতেমের মানে কী?

প্রশ্নকর্ত্তা—খাতেমের মানে seal (শীলমোহর), jewel (রত্ন), crown (রাজমুকুট)—এই রকম শুনেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ যদি হয়, তাহলে তো ঠিক আছে।

প্রশ্ন—কি রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি এইটে বুঝি যে, তাঁর seal (শীলমোহর) নিয়েই পরবর্ত্তী আসবেন। অর্থাৎ প্রেরিতের বৈশিষ্ট্যগত লক্ষণগুলি রসুলের মধ্যে যেমন প্রকট, পরবর্ত্তী যিনি আসবেন তাঁর মধ্যেও তেমনি প্রকট থাকবে। আবার, অন্যান্য প্রেরিতপুরুষদের মত তিনিও মনুষ্যকূলে মহার্ঘ্য রাজমুকুট বা রত্নস্বরূপ। তাকে যে মানে না, অভিবাদন জানায় না, মাথায় বয়ে নিয়ে বেড়ায় না, তাঁকে মেনো নাকো—এই হ'ল কথা। তিনি আসবেন এ লালসা আমরা রাখি, তিনি আসবেন না, এটা ভাবতে ভাল লাগে না। ছেলে মরে গেলে মা আশা করে, ঐ ছেলেই আবার তার কোলে আসবে।

আ. প্র. ৭/২৪.১.১৯৪৬

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন—মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যিকার ইসলামের প্রতিষ্ঠা যাতে হয়, সেজন্য আমাদের ঢের করবার আছে। কোরাণ, হাদিসের কদর্থ করে লোককে যেভাবে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে, কোন ধর্ম্মপ্রাণ লোকেরই তা বরদাস্ত করা উচিত নয়। সুনিষ্ঠ, ধর্ম্মাচরণ-পরায়ণ, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, বিজ্ঞ মুসলমান ভাইদের সংগ্রহ করে এই কাজে লাগাতে হয়। তাদের উপর প্রথমটা হয়তো অত্যাচার, অবিচার হবে। কিন্তু ধীরে-ধীরে লোকে বুঝবে—কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা। ধর্ম্মের সঙ্গে অসৎ-নিরোধ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আর এই অসৎ-নিরোধ করতে গিয়েই আসে opposition (বাধা) ও persecution (নির্যাতন)। তা overcome (অতিক্রম) করার মত কৌশল ও

শক্তি আয়ত্ত করতে না পারলে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হবে না। কিন্তু ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ব্যষ্টি ও সমষ্টির মঙ্গলের জন্য অপরিহার্য্য। তুমি মানুষকে টাকা দাও, পয়সা দাও, খেতে দাও, পরতে দাও, নারী দাও, মাটি দাও, শিক্ষা দাও, সভ্যতা দাও, কোন দেওয়াই দেওয়া হলো না, যতক্ষণ না তুমি তার মধ্যে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা করে তার ability (যোগ্যতা) ও self-control (সংযম) unlock (বিকশিত) করছ। Heaven (দিব্যধাম)-কে কে কত ভালবাসে, তার পরখ হলো মানুষের ভিতর heaven (দিব্যধাম)-কে সে কতখানি impart (সঞ্চারিত) করতে পারে। সেইজন্য গীতায় আছে—'যান্তি মদ্ যাজিনোঽপি মাম্।'

আ. প্র. ৭/১২.৪.১৯৪৬

একজন একাকী মুক্ত হওয়া সম্বন্ধে কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একজন একাকী মুক্ত হতে পারে, কিন্তু সে যদি পারিপার্শ্বিককে মুক্ত করে তুলতে চেষ্টা না করে, তবে পারিপার্শ্বিক তাকে টেনে-হিঁচড়ে নীচে নামাবেই। একা-একা ডুগডুগি বাজালাম, তাতে স্ফূর্ত্তি নেই। প্রবৃত্তিবশ্যতা থেকে মুক্ত না হলে অখণ্ডব্যক্তিত্ব গজায় না। ব্যষ্টিব্যক্তিত্ব sublimated (ভূমায়িত) হ'য়ে সমষ্টিব্যক্তিত্বে উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে। সমষ্টিব্যক্তিত্বে থাকে প্রত্যেককে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী পরিপূরণ করার আকূতি ও ক্ষমতা। সমষ্টিব্যক্তিত্বওয়ালা মানুষ ছাড়া গুরু হতে পারে না। একজনের কাছে যদি শুধু হিন্দুরই স্থান থাকে—মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক স্ব-স্ব বিশ্বাস ও শুভবৈশিষ্ট্যের পোষণ তার কাছ থেকে না পায়, সে আবার কেমন গুরু? এক-একজনের এক-এক রকম, কারও বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক, কারও ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে, কারও কৃষির দিকে, কারও গান-বাজনার দিকে, কারও সাধন-তপস্যার দিকে। কত রকমারি ধরনের লোক আছে। প্রত্যেক ধরনের লোককে যে বিহিতভাবে সমাদর ও সমাবেশ করে উদ্বর্দ্ধনের দিকে প্রেরণা ও নির্দ্দেশ দিতে না পারে, সে আর যাই হোক, সমষ্টিব্যক্তিত্বসম্পন্ন গুরু নয়।

জাতি ধর্ম্ম ও প্রকৃতি নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই সম্বর্দ্ধনী আশ্রয় আছে যাঁর কাছে তিনিই প্রকৃত গুরু। এমনতর গুরু না করলে মানুষ ঠকে যায়। গুরুর হয়তো গীতা পছন্দ হয় না, তার কাছে কেউ গীতা বুঝতে গেল, অমনি কদর্থ করে ছেড়ে দিলেন। আবার, গীতাকে সমাদর করলেন তো বাইবেল, কোরাণকে আমল দিলেন না। ভেদবুদ্ধি চারানই এদের ব্যবসা। মানুষ যাতে বৈশিষ্ট্য

অক্ষত রেখে সংহত হতে পারে, তার কায়দা তাদের কাছে মেলে না। তাদের বিচার, বিবেচনা, সমালোচনা সবই একপেশে—constructive (গঠনমূলক) ও fulfilling (পরিপূরক) নয়।

রসুল তাঁর পূর্ব্বপুরুষকে অস্বীকার করেননি। পূর্ব্বতন মহাপুরুষদের অস্বীকার করেননি, পরবর্ত্তী কেউ হাবসীদের ক্রীতদাস হয়ে আসলেও তাঁকে অস্বীকার করার কথা বলেননি। কিন্তু আমরা তা করি। রসুলের বিদায় হজের নির্দ্দেশ আমরা পদে-পদে লঙ্ঘন করছি। বাইবেলেও পরিপূরণের কথা আছে, কাউকে অস্বীকার করার কথা নেই। তা থাকবেই বা কেন? কাউকে অস্বীকার করলে, যাঁকে গ্রহণ করছি, তাঁকেই যে অস্বীকার করা হ'লো। প্রত্যেক পরবর্ত্তীর মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তীর প্রতি স্তুতি যদি না থাকে, পূর্ব্ববর্ত্তী explained (ব্যাখ্যাত) হন না, গ্লানি অপসারিত হয় না, তাঁদের আবির্ভাবের রহস্য ব্যক্ত হয় না। প্রকৃত মহাপুরুষ যাঁরা, তাঁদের মধ্যে কখনও কোন অসঙ্গতি নেই। অসঙ্গতির সৃষ্টি করে তথাকথিত ভক্ত ও প্রচারকের দল। এইভাবে deviation (বিচ্যুতি) না হলে যীশু ও রসুল থেকে বঞ্চিত হয়েছে যারা তাদের অধিকাংশই বঞ্চিত হত না। আমি হিন্দু থেকেও যীশু-রসুলকে মহাপুরুষ বলে নতি জানাবার পথে আমার বাধা কোথায়? তাঁদিগকে যথাযথভাবে বোঝার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে তথাকথিত প্রচারক ও ব্যাখ্যাতার দল।

আব্দুল ভাই—একই কি বিভিন্নরূপে আসেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাঁদের মত। কেউ প্রতিপদের, কেউ দ্বিতীয়ার, এইরকম। কিন্তু চাঁদ একটা। সবের মধ্যেই খোদার নূর। দেশ-কাল-পাত্রভেদে যখন যেখানে যে exposition (ব্যাখ্যা) দরকার, তখন সেইভাবে বিকাশ। কাউকে অস্বীকার করলে খোদাকেই অস্বীকার করলাম। ধর্ম্মকে ফারাক করাই মহাপাপ ও পাতিত্য। একই ধর্ম্ম এক-এক সময়ে এক-এক দেশে এক-এক জনের ভিতর দিয়ে রূপ পেয়েছে। সর্ব্বত্রই একই সত্য, একই ধর্ম্মবাণী, দেশকালের উপযোগী করে রকমারিভাবে বলা। আমরা আজকাল স্মৃতিশাস্ত্র মানতে চাই না, কিন্তু শ্রুতিসম্মত স্মৃতি না-মানাটা অন্যায়। আজকাল অনেক মহানের কথা শুনি, তাঁরা বিয়ে-থাওয়া সম্বন্ধে কোন বিধিনিষেধের কথা শুনলে, সেটাকে সঙ্কীর্ণতার লক্ষণ বলে মনে করেন। এ-সম্বন্ধে আমার মনে হয়, প্রাণ-বায়ুর গতায়াত যতদিন দুটো সঙ্কীর্ণ নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়ে চলে, ততদিনই মানুষ জীবিত থাকে, যখন সে এই বন্ধনকে, সঙ্কীর্ণতাকে অস্বীকার করে বিশ্বের

বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়, তখন সে হয়তো মুক্ত হয়, কিন্তু সে-মুক্তি মানে মানুষের মৃত্যু। সত্তাপালী বিধির বাধ্য না হওয়া মানে মৃত্যুবাহী শয়তানের চেলা হওয়া।

আ. প্র. ৭/৮.৫.১৯৪৬

কয়েকজন মুসলমান ভাইয়ের সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন— 'পুকুর নষ্ট করে পানা, দেশ নষ্ট করে কানা।' কানা মানে যার এক চোখ নেই। হিন্দু নেতা হোক, মুসলমান নেতা হোক, তারা যদি একচোখো হয় অর্থাৎ এক সম্প্রদায়ের দিকে চোখ থাকে, আর-একদিকে না থাকে, তবে দেশের সর্ব্বনাশ। চোখ থাকা বলতে শুধু কতকগুলি অভাব-অভিযোগ ও দাবী-দাওয়া পূরণ নয়, বরং তাদের শুধরে তোলা, যোগ্য করে তোলা, তাদের বরাবরের জন্য ভাল যাতে হয়, তাই করা। তা করতে গেলেই খোদাতালার পথে চলতে হয়, চালাতে হয় মানুষকে সেই দিকে। খোদাতালা একজন ছাড়া দুজন নেই, তাঁর প্রেরিত যাঁরা, তাঁরাও এক পথের পথিক। সেই পথ হলো ধর্ম্মের পথ, বাঁচাবাড়ার পথ। সে পথও এক বই দুই নয়। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ জিনিসটা আগে ছিল না, চেষ্টা করে বাধিয়েছে। হিন্দু মুসলমানের মসজিদ করে দিয়েছে, মুসলমান হিন্দুর মন্দির করে দিয়েছে এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

একজন মুসলমান ভাই—আপনার কথাগুলো কত সুন্দর!

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই কথাই চিরকালের কথা।

আ. প্র. ৮/২৫.৬.১৯৪৬

একজন মুসলমান ভাই ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা তুললো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খোদার পথে চলাই ধর্ম্ম। খোদার মালুম পাওয়া বড় শক্ত। সেইজন্য 'প্রেরিত' লাগে। প্রেরিত-মানুষ খোদা ধরার যন্ত্র। খোদার শরিক নাই, ধর্ম্মেরও শরিক নাই। সব প্রেরিত-মানুষই একই খোদার কথা কন। এঁদের মধ্যে প্রভেদ করায় খোদাকেই প্রভেদ করা হয়। আর, তাই-ই হলো কাফেরত্ব।

প্রশ্ন—জাত কি খোদা সৃষ্টি করেছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গরু, গাছপালা, সবটার মধ্যেই জাত আছে। ধান চাষ কর, তার মধ্যেই দেখ কত রকমের ধান আছে। এক-একটা এক-এক সময়ে হয়, ফলানর কায়দা আলাদা, ধানের চেহারা আলাদা, চালের স্বাদ আলাদা। জাত মানে জন্ম। যার যে-ধরনের বীজে জন্ম, তার জাতও তেমনতর। হুবহু এক

এমনতর দুটো দেখতে পাবে না। এক ভগবান সৃষ্টির প্রতি বস্তুতে প্রতি একরকম। ন্যাংটাবেলায় দেখতাম—গাছের দুটো পাতা একরকম নয়। বাঁশের ঝাড়ের মধ্যে দুটো বাঁশ একরকম নয়। দেখতাম আর ভাবতাম—ভগবান বোধ হয় একই, তাই তাঁর সৃষ্টিতে একটির মত আর-একটি মেলে না। সবটার ভিতর-দিয়ে তিনি বলছেন—আমি এক। একটু বড় হয়ে স্কুলে গেলাম। মাষ্টারমশায় বললেন—এক আর এক দুই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কেন? দুই হলো কেমন করে? এ একটা ও আর-একটা, দুটো এক তো দেখি না, তবে দুই এক আসে কোত্থেকে? এবং এক আর একে দুই-ই বা হয় কী করে? ....মাষ্টারমশাই আমার কথা বুঝলেন না, আমাকে কেবল মারলেন। .....ঐ যে বলেছিলাম বীজের কথা। এক-এক জাতীয় বীজের থেকে এক-এক রকম শ্রেণী বা বর্ণ হয়। তাদের ধরণ-ধারণ, করণ-কারণও আলাদা হয়। তোমাদের মুখেই তো শুনেছি—নিকেরী, নলে, কষাই ইত্যাদি শ্রেণী আছে। আবার কত সম্ভ্রান্ত মুসলমান আছে। সবাই তো এক পর্য্যায়ের না। এদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনা, চালচলন, আচার-ব্যবহারে ঢের ফারাক আছে।

উক্ত ভাই—তাই বড় ঘরের মুসলমানরা ঐসব ঘরে ভাতজল খায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাতজল খায় না, তার মানে এ নয় যে ঘৃণা করে। ভাবটা উন্নত রাখতে গেলে আচার-বিচারও তেমনি মেনে চলতে হয়, যেখানে-সেখানে যথেচ্ছ আহার-বিহার করা চলে না।

আ. প্র. ৮/৪.৭.১৯৪৬

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হজরত রসুল বলে গেছেন—'ধর্ম্ম সম্বন্ধে কখনও বাড়াবাড়ি করবে না।' অর্থাৎ just to the line, just to the level (ঠিক পথে, ঠিক মাত্রায়) চলবে। ধর্ম্ম হলো বিজ্ঞান। যথাযথতা এর একটা প্রধান কথা। যা করলে ধর্ম্ম হয়, তাই করলেই ধর্ম্ম হয়। আবোল-তাবোল করলে হয় না। ইষ্টানুগ সঙ্গতি নিয়ে নিজের ও পরিবেশের বাঁচা-বাড়া যাতে অব্যাহত থাকে, তেমন করে চলাই ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণের গুরু ঘোর আঙ্গিরস নাকি তাঁকে বলেছিলেন—'অচ্যুত ভব'। ঐটে হলো ধর্ম্মের প্রধান কথা। রসুলের কথাও কত চমৎকার। তিনি নাকি বলেছিলেন—তোমরা নিজ ধর্ম্মমতে নিষ্ঠা রাখবে কিন্তু অপরের ধর্ম্মমতকে শ্রদ্ধা করবে। এমনকি অপরের ধর্ম্মস্থান যদি অসংস্কৃত থাকে, তাও সংস্কার করে দেবে।

আ. প্র. ৯/১৩.৭.১৯৪৭

কয়েকজন মুসলিম দর্শনার্থীর সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ধর্ম্মের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্বন্ধ নেই। ধর্ম্ম বলে, পূর্ব্বপুরয়মাণ, বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাসম্বর্দ্ধনী প্রত্যেকটি মহাপুরুষকে মানতে। রসুল যেমন তোমাদের, তেমনি আমাদেরও। তিনি সবারই। যীশুখ্রীষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ইত্যাদি প্রত্যেকের সম্বন্ধেই ঐ কথা। আমি হিন্দু বলে রসুলকে, যীশুখ্রীষ্টকে বা বুদ্ধদেবকে ভক্তি যদি না করি, তাহলে আমার হিন্দুত্বেরই অবমাননা হয়। ওঁদের মধ্যে বিভেদ করাই অন্যায়। আমি শ্রীকৃষ্ণকে মানি অথচ তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তীদের ও পরবর্ত্তীদের মানি না, তার মানে আমি শ্রীকৃষ্ণকেও মানি না। এক-একজন মহাপুরুষকে অবলম্বন করে এক-এক সম্প্রদায় হলেও, যেহেতু প্রকৃত মহাপুরুষরা সবাই এক বার্ত্তাবাহী ও একেরই নানা কলেবর, সেইজন্য প্রত্যেক মহাপুরুষই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের। আর, পিতৃবংশ ও পিতৃকৃষ্টিকে অস্বীকার করতে উৎসাহিত করে তথাকথিত conversion (ধর্মান্তরকরণ) চালানোর ফলে, অযথা আল সৃষ্টি করা হয়েছে। খোদাতালার অভিসম্পাত আমাদের উপর পড়েছে। রসুল চাননি যে, কেউ পিতৃপুরুষের পরিচয় মুছে ফেলুক, এক বংশের মানুষ নিজেকে আর-এক বংশের মানুষ বলে পরিচয় দিক। এইসব অপকর্ম্ম করে বিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। আমি বুঝি, খোদার প্রতি, রসুলের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস যাদের থাকবে, তাদের দিয়ে মানুষের উপকার ছাড়া অপকার হবার কথা নয়। আমরা বেশীর ভাগ মানুষ ধর্ম্মের পথে চলি না, ধর্ম্মের নামে নিজেদের বৃত্তিস্বার্থ চরিতার্থ করি। তাতেই যত গোলমাল হয়। আর, তথাকথিত ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতা যারা, তারা ইচ্ছা করেই বহু জিনিসের বিকৃত ব্যাখ্যা করে।

একজন বললেন—আপনার কথা তো খুব ঠিক। কিন্তু পরিবেশ যেখানে বিকৃত সেখানে কী করা সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিকৃতিকে সুকৃতিতে পরিণত করা আমাদেরই দায়িত্ব। নইলে কেউ রেহাই পাব না। নিজেরা ঠিক বুঝে নিয়ে চলা লাগে। আর, মানুষের ভিতরও তাই চারাতে হয়—যাতে নিজেদেরও ভাল হয়, অপরেরও ভাল হয়।

আ. প্র. ৯/২৪.৮.১৯৪৭

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন—ধর্ম্ম মানে বাঁচাবাড়ার বিজ্ঞান। যে-কোন মহাপুরুষই তার প্রবক্তা হউন না কেন, তাতে ধর্ম্মের কোন পরিবর্ত্তন হয়

না; ধৰ্ম্ম চিরকালই এক। হিন্দুর ধর্ম্ম যা, মুসলমানের ধর্ম্মও তাই; প্রত্যেক ধর্ম্মমতের লোকই ঈশ্বর-পন্থী। আর, সেই ঈশ্বর একজন ছাড়া দুইজন নন। তাঁর প্রেরিত বাণীবাহক যাঁরা, তাঁরাও একই সত্যের উদ্‌গাতা—একই পথের পথিক— নানা কলেবরে একই সত্তা। তাই ধর্ম্ম মানুষকে মিলিত ছাড়া বিচ্ছিন্ন করে না। ধর্ম্মের থেকে চ্যুত হলেই সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে বিভেদ-বিরোধের সৃষ্টি হয়। হিন্দু যদি প্রকৃত হিন্দু হয়, মুসলমান যদি প্রকৃত মুসলমান হয়, তারা বান্ধববন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য; বাপকে যে ভালবাসে, সে কখনও ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হতে পারে না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উপাস্যই এক ও অদ্বিতীয়; তাই সম্প্রদায়গুলি ভাই-ভাই ছাড়া আর কি? মানুষের সহজ বুদ্ধিতে সবই ধরা পড়ে; গোলমাল করে দুরভিসন্ধিপ্রসূত অপব্যাখ্যা ও অপযাজন। ধর্ম্ম যদি বিপন্ন হয়ে থাকে, তবে সবচাইতে বেশী বিপন্ন হয়েছে, এমনতর ব্যাখ্যাতা ও যাজকদের হাতে। প্রত্যেক ধর্ম্মমতের আসল রূপটি তুলে ধরতে হবে সাধারণ লোকের কাছে; তাহ'লে দুষ্টলোকের জারীজুরি খাটবে না। হিন্দুর যেমন হিন্দুত্বের বিকৃতি বরদাস্ত করা উচিত নয়, তেমনি উচিত নয় ইসলামের বিকৃতি বরদাস্ত করা। মুসলমানেরও তেমনি উচিত নয় ইসলাম ও হিন্দুত্বের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া। কোন ধর্ম্মাদর্শকে ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া মানে শয়তানের সাগরেদি করা। আমাদের নিজেদের যেমন ধর্ম্মপরায়ণ হয়ে উঠতে হবে—পরিবেশকেও তেমনি ধর্ম্মপরায়ণ করে তুলতে হবে—প্রত্যেককে তার বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম্মাদর্শ অনুযায়ী। হিন্দু যেমন গীতা পড়বে, তেমনি কোরাণ-বাইবেলও পড়বে; মুসলমান যেমন কোরাণ পড়বে, তেমনি গীতা-বাইবেলও পড়বে। প্রত্যেকে চেষ্টা করবে বাস্তব আচরণে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হতে এবং অন্যকেও সাহায্য করবে ও প্রেরণা জোগাবে অমনতর হয়ে উঠতে। এমনতর হতে থাকলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য গড়ে তুলতে কদিন লাগে? আমি তো বুঝি, হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা যেমন আমার দায়, ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্ম প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাও তেমনি আমারই দায়। আমার পরিবেশের প্রত্যেকে তার মত করে যদি ঈশ্বরপরায়ণ না হয়ে ওঠে, আদর্শপ্রেমী না হয়ে ওঠে, ধর্ম্মনিষ্ঠ না হয়ে ওঠে, তাহলে তো আমারই সমূহ বিপদ। পরিবেশকে বাদ দিয়ে আমার একলা ধর্ম্ম করা অর্থাৎ বাঁচাবাড়ার পথে চলা তো সম্ভব নয়।

আ. প্র. ৯/২.১০.১৯৪৭

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে বললেন—আপনি কিন্তু কোরেশ বংশ সম্বন্ধে বিশেষ ও বিশদ তথ্য সংগ্রহ করবেনই। আমার মনে হয়, ইসলামের মধ্যে যা-কিছু আছে তার কোনটারই কোন অমিল নেই আমাদের সঙ্গে। আরবী ভাল করে শেখা লাগে। কোরাণ-হাদিস একত্বানুধাবনী দৃষ্টি নিয়ে তন্ন-তন্ন করে পড়তে হয়। মূলে সব এক। কেবল ভাষা আলাদা, রকম আলাদা। বহু জিনিস সম্বন্ধেই আমি দেখেছি original (মৌলিক)-টা বুঝতে কোন বেগ পেতে হয় না। কিন্তু ব্যাখ্যাকারদের পান্ডিত্যের কেরদানীর দরুণ সহজ জিনিসটা জটিল হয়ে যায় এবং সর্ব্বাঙ্গীণ সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। মহাপুরুষদের কথার মধ্যে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁদের সব কথাই এক-সূত্রসঙ্গত। কোনটার সঙ্গে কোনটার বিরোধ নেই। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে তাঁরা বিভিন্ন কথা বললেও দেখা যায় সবগুলির মূল উদ্দেশ্য এক অর্থাৎ জীব-কল্যাণ। বাঁচা-বাড়ার উল্টো কোন কথা তাঁদের মধ্যে পাওয়া যায় না। আবার, তাঁরা কখনও বৈশিষ্ট্যকে বরবাদ করতে বলেন না। বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে মানুষের আর কিছু থাকে না।

আ. প্র. ১০/৩১.১.১৯৪৮

হিন্দু-মুসলিম অনৈক্যের প্রতিকার-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হিন্দু মুসলমানের নামে নাক সিঁটকায়, মুসলমান হিন্দুর নামে নাক সিঁটকায়—তার মানে তারা ভগবানকে, ধর্ম্মকে, প্রেরিতকে ভালবাসে না। আর্য্যরা মানে এক অদ্বিতীয়কে, পূর্ব্বতন ঋষি মহাপুরুষদিগকে, তারা মানে পূর্ব্বপুরুষকে ও জন্মগত বিশিষ্ট গুণসম্পদকে অর্থাৎ বর্ণধর্ম্মকে, সর্ব্বোপরি তারা মানে বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যুগপুরুষোত্তমকে। এগুলি মালার মত গাঁথা আছে। যাদের দেখার চোখ আছে ও দেখতে চায় তারাই দেখতে পায়। বেদ্, কোরাণ, বাইবেল ঘেঁটে দেখ, সব জায়গায় ঐ একই জিনিস রকমারিভাবে পাবে। অন্ততঃ ওগুলির উল্টো কথা পাবে না। কোরাণে স্পষ্ট করে আছে পিতৃপুরুষকে স্বীকার করার কথা। আমি ইসলামের ভক্ত হলে আমার নাম গোলাম সোফান হবে কেন? অনুকূল চক্রবর্ত্তীই তো থাকা উচিত। কারণ, খোদাতালা যেমন সকলের, রসুলও যেমন সকলের, ইসলামও তেমনি সকলের। মুসলমানদের মধ্যেও বংশগত আভিজাত্য ও বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা দিয়ে চলার কথা আছে। এর ভিতর দিয়েই তো বর্ণধর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য সম্বন্ধে

সমর্থন পাওয়া যায়। আজ আমরা বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করতে চাই কেন? রসুলের কি তেমন কোন কথা আছে? আর, নিজেদের বৈশিষ্ট্যকে যদি বজায় রাখতে চাই, তবে অপরের বৈশিষ্ট্য যাতে বজায় থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা লাগে। অপরের বৈশিষ্ট্য ভাঙ্গার প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিলে, কালে-কালে নিজের বৈশিষ্ট্য ভাঙ্গার পথই প্রশস্ত হয়।

আমি বলি, আমি যদি হজরতকে ভালবাসি এবং তাঁর নীতিবিধি মেনে চলি, তবে আমি হিন্দু থাকব না কেন? পরমপিতার পথে চলতে গিয়ে পিতৃপুরুষের পরিচয় খোয়াতে হবে কেন? আমি তো বুঝি হিন্দুও আর্য্য, মুসলমানও আর্য্য। উভয়েরই পন্থা ও গন্তব্য এক। হজরত পূর্ব্ববর্ত্তীকে মানেন, পরবর্ত্তীকে মানার ইঙ্গিতও তিনি দিয়ে গেছেন, তিনি যা মানেন, আমরা যদি তা না মানি, তার মানে আমরা তাঁকে মানি না। মুসলমানের পীরের কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়া লাগে, হিন্দুরও গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়া লাগে, সেই একই তো কথা। শুধু ভাষা আলাদা। কতকগুলি নীতি আছে দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা সবার পালনীয়, আবার কতকগুলি আছে বিশেষ-বিশেষ ব্যক্তির, বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় ও দেশকালে পালনীয়। এই দুটোর মধ্যে গুলিয়ে ফেলতে নেই। Fundamental (মৌলিক) ও universal (সার্ব্বজনীন) জিনিস হল—এক অদ্বিতীয়কে মানা, পূর্ব্বতন ঋষি-মহাপুরুষকে মানা, পিতৃপুরুষকে মানা, বৈশিষ্ট্য মানা, পূরয়মাণ যুগপুরুষোত্তমকে অনুসরণ করে চলা। তুমি হিন্দুই হও বা মুসলমানই হও এগুলি যদি না মান, তুমি হিন্দুও নও, মুসলমানও নও, এক কথায় তুমি ম্লেচ্ছ দলভুক্ত, ম্লেচ্ছ মানে সংস্কৃতির উল্টো চলে যারা। আর, যে এইগুলিকে মেনে চলে, সে যে-সম্প্রদায়েরই লোক হোক না কেন, তাকে তুমি কখনও কাফের বলতে পার না। কাফের মানে যে ধর্ম্মবিরোধী চলায় চলে। সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রশ্রয় না দিয়ে, ধর্ম্মবিরুদ্ধ চলনের বিরুদ্ধে আমাদের জেহাদ ঘোষণা করা লাগে। তাই করা লাগে যাতে প্রতি-প্রত্যেকে ঈশ্বরপ্রেমী হ'য়ে ওঠে, ধর্ম্মপ্রবুদ্ধ হয়ে ওঠে। এ দায় হিন্দু-মুসলমান সকলেরই মিলিত দায়। তাই এই কাজে হিন্দুর মুসলমানকে সাহায্য করা উচিত, মুসলমানেরও হিন্দুকে সাহায্য করা উচিত।

তোয়েব হোসেন—মুসলমানরা বলেন, হজরত শেষ নবী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর কালে তিনি তো শেষতম নবী। যে কালে যিনি আসেন, তখনকার মত তিনি তো শেষতম ও চরম। তাঁর মধ্যে যেমন পূর্ব্বতনরা

থাকেন, তাঁর পরবর্ত্তী আবির্ভাবের মধ্যেও আবার তিনিই থাকেন। পরবর্ত্তী আসলে পূর্ব্বতনরা মুছে যান না। বরং তাঁরা জীয়ন্ত মূর্ত্তিতে একদেহে সংহত হয়ে থাকেন তাঁর ভিতর। নবীন প্রাচীনেরই নবকলেবর। যেন একেরই দেহান্তর গ্রহণ। 'স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ'। বর্ত্তমান প্রেরিতপুরুষের মধ্যে পূর্ব্বতনরা তো থাকেনই, আরো থাকে যুগোপযোগী বিবর্ত্তন ও পরিপূরণ। যীশু বলেছেন, 'I am come to fulfil, and not to destroy' (আমি পরিপূরণ করতে এসেছি, ধ্বংস করতে আসিনি)। তাই বর্ত্তমানের গুরুত্ব এত বেশী, কারণ, তিনি পূর্ব্বতনদেরই আরোতর পরিণতি। তাছাড়া, আতস পাথরের মধ্য-দিয়ে যেমন সূর্য্যের রশ্মি converge করে (কেন্দ্রীভূত হয়ে) আগুন জ্বলে, বর্ত্তমানের মধ্য-দিয়ে তেমনি পূর্ব্বতনরা জীয়ন্ত হয়ে ওঠেন আমাদের কাছে। বর্ত্তমান ইমামের মধ্য দিয়েই রসূলকে বোঝা যায়। রসুলগতপ্রাণ মানুষের ভিতর-দিয়ে ছাড়া রসুলকে বুঝি কি করে? যে ভগবানকে কায়মনোবাক্যে বরণ করে ভগবান তাকে তাঁর ইচ্ছাপূরণের যন্ত্রস্বরূপ মনোনয়ন করেন, তাকে আশ্রয় করে ভগবানের ইচ্ছাই জয়যুক্ত হয়। ভগবান মানে materialised man (মূর্ত্ত মানুষ), ষড়ৈশ্বর্য্যবান পুরুষ। তিনি যাঁর কথা বলেন তাঁকে ব্রহ্ম, আল্লা, আত্মা ইত্যাদি বলতে পারি। দয়াবানকে বাদ দিয়ে দয়া উপলব্ধি করার জো নেই। ক্রোধী ছাড়া ক্রোধের প্রকাশ পাওয়া কঠিন। রসুলকে বাদ দিয়ে আল্লা মিলবে না। তবে আমার কথা এই যে 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।' তাই ব্রহ্ম বা আল্লাকে যিনি পেয়েছেন, জেনেছেন, এমন মানুষকে খুঁজে বের করতে হবে। তাঁর শরণাগত হতে পারলে আর ভাবনা নেই। তিনি প্রত্যেককেই তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী চালনা করেন। তাই তাঁকে পেলে চলার পথ সহজ হয়ে যায়। আর, অমনতর মানুষের আশ্রয় পেলে বুক ফুলিয়ে দুনিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা ঘোষণা করাই লাগে।

আ. প্র. ১১/১৭.৩.১৯৪৮

কথাপ্রসঙ্গে একজন বললেন—মুসলমান ভাইদের সঙ্গে এমনি মেলা-মেশা করা যায়, রসুলের সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনাও করা যায়, কিন্তু শেষ নবী কথা নিয়েই খটকা বেধে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-কথায় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, সে-কথা তোলার দরকার কী? নবী না আসুন, ইমাম তো আসতে পারেন। নবীকে পরিবেষণ করেন যিনি,

তিনিই ইমাম। নবীকে ভালবাসা, মানা ও পরিবেষণ করা মানে সব মহাপুরুষকে ভালবাসা, মানা ও পরিবেষণ করা। একজনকে ভালবাসি, আর-একজনকে ভালবাসি না, এ হয় না। আমার এত ভাল লাগে রসুলকে, তাঁর প্রত্যেকটা footstep (পদক্ষেপ)-ই পরম সুন্দর। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তীদের কথা তাঁর চরিত্র ও জীবন দিয়ে এমনভাবে পরিবেষণ করে গেছেন, fulfil (পরিপূরণ) করে গেছেন যে তা দেখে মনে হয় যে তিনি নিজে যেন তাঁর fore-runner (পূর্ব্ববর্ত্তী)-দের একজন concentrating agent (কেন্দ্রায়নী কর্ম্মাধ্যক্ষ)। আমরা follow (অনুসরণ) করব তাঁকে যিনি পূর্ব্বতনের সঙ্গে সঙ্গতিসূত্র অবিচ্ছিন্ন রেখে তাঁদের fulfil (পরিপূরণ) করে চলেন। তা বাদ দিয়ে যদি glowing truth (দীপ্ত সত্য) বলেও কেউ কিছু জাহির করেন, তা জানতে পারি কিন্তু তা follow (অনুসরণ) করতে পারি না। 'স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।' Evolution (বিবর্তন)-এর মধ্যে একটা কার্য্যকারণসম্পর্ক আছে, ধারাবাহিকতা আছে, পারম্পর্য্য আছে। নবীনের মধ্যে যতই নূতনত্ব থাক না কেন, তার বীজ নিহিত থাকে প্রাচীনে। মোটকথা, fundamental truth (মৌলিক সত্য) নিয়ে deal (কারবার) করলে পূর্ব্বতনের সঙ্গে বিরোধ থাকতে পারে না। Fundamental (মূলতত্ত্ব) বাদ দিয়ে মন গড়া অবান্তর উপপথে চললে conflict (দ্বন্দ্ব) অনিবার্য্য হয়ে ওঠে। একটা কথা আমার কাছে স্বতঃসিদ্ধের মত মনে হয়। সেটা হচ্ছে forefather (পূর্ব্বপুরুষ)-কে betary (বিশ্বাসঘাতকতা) করে, blood (রক্ত)-কে betray (বিশ্বাসঘাতকতা) করে, কোন prophet (প্রেরিত)-কে ভালবাসতে গেলে সেই prophet (প্রেরিত)-কেই betrey (বিশ্বাসঘাতকতা) করা হয়। তাই আমি proper initiation-এ (বিহিত দীক্ষায়) বিশ্বাস করি, কিন্তু conversion (ধর্ম্মান্তরকরণ) -এর তাৎপর্য্য কি তা বুঝতে পারি না। আমার ধারণা, একজন খাঁটি হিন্দু, একজন খাঁটি মুসলমান ও একজন খাঁটি খ্রীষ্টানের মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য সত্ত্বেও অন্তরের মিল না থেকে পারে না। কারণ, এরা সবাই যে এক পথের পথিক। পরমপিতাকে মানুষ যে নামেই ডাকুক, যে রূপেই ভজুক, পরমপিতাকে ভজনা করার একটা প্রভাব আছে। তাঁর দিকে এগুতে থাকলে মানুষ প্রেমী হয়ে ওঠে, জ্ঞানী হয়ে ওঠে, সবার প্রতি দরদী সেবামুখর হয়ে ওঠে, সবাইকে সয়ে-বয়ে আপন করে নিতে শেখে। চরিত্রই বলে দেয় কে ধর্ম্মপথে চলছে বা চলছে না। একজন হিন্দু সন্ন্যাসী 'হা গৌরাঙ্গ' বলে পথে-পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে, অথচ যদি দেখ যে রসুলকে মানে না, যীশুখ্রীষ্টকে মানে না, তা হলে তখনই ধরে নেবে—

He is not properly adjusted, he is not fit to be followed because he does not love all the Prophets with a single eye and so he is a man of incomplete knowledge. (সে ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত নয়, সে অনুসৃত হবার যোগ্য নয়, কারণ, সে সব প্রেরিতকে একদৃষ্টিতে ভালবাসে না, আর তাই সে অসম্পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ)। যার মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের প্রতিষ্ঠা হয়নি, তাকে অনুসরণ করায় বিপদ আছে।

আ. প্র. ১১/১৮.৩.১৯৪৮

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—রসুলের কথা ভাল করে বলা লাগে। রসুল কথার মানে আচার্য্য, যিনি ভগবানের আদেশ, নিদেশ ও নীতি নিজের জীবনে পরিপালন করেন, মূর্ত্ত করে তোলেন। তিনি শুধু নিজের জীবনে ঈশ্বরের নীতি-নির্দ্দেশ মূর্ত্ত করে তুলেই ক্ষান্ত হন না, প্রীতি, সেবা, সাহচর্য্য ও সঞ্চারণার ভিতর-দিয়ে সমাজ-জীবনেও তিনি তা মূর্ত্ত করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁকে যারা ভালবাসে, যারা তাঁর girdle (বেষ্টনী), তাদেরও জীবনের ব্রত হয় তাঁকে, তাঁর অভিযানকে propagate (প্রসারিত) করা। এইটেই হল লোকমঙ্গলের মৌলিক উপাদান। আর, নবী বলতে আমি বুঝি তাঁকে, যিনি ভগবানের বাণী ও প্রেরণা লাভ করেন। হজরত রসুল শেষ নবী হউন তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু যুগে যুগে আমরা চাই তাঁর living continuity (জীয়ন্ত ক্রমাগতি)—তা ইমামের মধ্য-দিয়েই হোক, আর যাঁর মধ্য-দিয়েই হোক, এবং তাঁকে যে নামেই অভিহিত করা হোক। ভগবদ্বাণী ও ভগবত প্রেরণার সঞ্জীবনী সংস্পর্শ ছাড়া আমরা জ্যান্তে মরা হয়ে থাকি। শুনেছি, রসুল পূর্ব্বতনকে মানার কথা যেমন বলেছেন তেমনি আবার বলেছেন—যদি কোন হাবসী ক্রীতদাসও তোমাদের কোরাণ অনুসারে পরিচালিত করেন, তবে তোমরা তাঁর আদেশ পালন করে চলো। আর, এটা ঠিক জেনো—কোরাণ, বেদ, বাইবেল, গীতা ইত্যাদির মধ্যে যেমন কোন বিরোধ নেই, বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ মহাপুরুষ, তা তিনি পরবর্ত্তী যে-যুগেই আবির্ভূত হউন, তাঁর বাণীর মধ্যে কোরাণ, বেদ, বাইবেল, গীতার পরিপন্থী কোন কথা থাকে না, বরং থাকে যুগোপযোগী পরিপূরণ। তাই পরবর্ত্তীর মধ্যে আমরা পূর্ব্ববর্ত্তীকে আরো করে পাই। একই ঈশ্বরপ্রেরণার প্রবাহই তো যুগ-যুগ ধরে বয়ে চলে আরো আরোতর অভিব্যক্তি নিয়ে—প্রয়োজন ও পরিস্থিতির পরিপূরণে। সৃষ্টি যতদিন থাকবে, ততদিন এ ধারা চলতেই থাকবে।

আ. প্র. ১১/৭.৫.১৯৪৮

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের মধ্যে যেমন শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি আছে, কারও জাত যায়নি, তেমনি হিন্দু সমাজভুক্ত থেকেই অনেকে রসুলকে অনুসরণ করতে পারত, যদি পিতৃপুরুষকে অস্বীকার করতে না হত।

আ. প্র. ১২/২৫.৬.১৯৪৮

আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মুসলমান বলে তো আলাদা জাত ছিল না। ....রসুলকে কেন্দ্র করে যারা ছিল, তাদের নাম হয়েছিল মুসলমান। রসুলের খুব strong girdle (শক্তিমান আবেষ্টনী) ছিল। তিনি জবর মাল কটি পেয়েছিলেন, যার ফলে অত বাধা-বিঘ্নের মধ্যে win (জয়) করে গেলেন। .....রসুল কত নিষেধ করতেন শিষ্যদের— শত্রুদের প্রতিশোধ না নিতে, কিন্তু তাঁর শিষ্যরা তাঁর পায়ে ধরে বলত— তোমার জীবনে যা হানি আনে, তা আমরা সইব না, সে-আদেশ আমরা পালন করতে পারব না। কী তীব্র ভালবাসা।

আ. প্র. ১২/৮.৭.১৯৪৮

লাহোর থেকে একখানি হাদিস এসেছে ডাকে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে সে কথা জানাতে তিনি চকিতে উঠে বসে সসম্ভ্রমে হাদিসখানি দুই হাতে গ্রহণ করে কপালে ঠেকালেন। পরে চশমা চোখে পরে হাদিসখানি পড়তে লাগলেন। পড়তে-পড়তে উল্লাসভরে বলে উঠলেন— সব জায়গায়ই এক কথা, শুধু দেশ-কাল-পাত্রভেদে রকমারি করে বলা। মনে হয় যেন সব-কিছু আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থাদির প্রতিচ্ছবি।

আ. প্র. ১২/৯.৭.১৯৪৮

ইসলাম-সম্পর্কে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এটা out and out Aryan Culture (পুরোপুরি আর্য্যকৃষ্টি)—এক কথা, এক ছাঁচ, এক সুর। আর্য্যদের কটা জিনিস—এক এবং অদ্বিতীয় স্রষ্টা যিনি তিনি আমাদের অনুসরণীয়, পুরয়মাণ ঋষিরা অনুসরণীয়, ইষ্টকৃষ্টির পথচারী পিতৃপুরুষগণ অনুসরণীয়, বর্ণাশ্রম অনুসরণীয়, পরিপূরক বর্তমান পুরুষোত্তম অনুসরণীয়। রকমারিভাবে রসুলের মধ্যেও এই কথা পাওয়া যায়। খোদাতালা এক এবং তাঁকে পাওয়ার পথই হলেন রসুল। রসুলের প্রতিনিধি স্বরূপ কেউ হাবসীদের

ক্রীতদাস হয়ে আসলেও তাঁকে অনুসরণ করার কথা বলে গেছেন রসুল। অবশ্য, যদি তিনি কোরাণের নীতি-অনুযায়ী চলেন ও চালনা করেন। সবাই এক সত্যে উপনীত হয়ে একই কথা বিভিন্ন ভাষায় বলে গেছেন। তাই বলে বিজ্ঞান। যারাই পরমপিতার পথে চলবে তাদের সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রেখে চলার কথাও বলেছেন। তাদের হিংসা করাই পাপ। তাদের হিংসা করলে ধর্ম্মকেই হিংসা করা হবে— এমন ধরণের কথাও নাকি আছে। প্রেরিতপুরুষদের মধ্যে পার্থক্য করা, কাউকে ছোট বলা, কাউকে বড় বলা যে কাফেরত্বের লক্ষণ এ-কথা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করা আছে। আর, পূর্ব্বপুরুষকে অস্বীকার করা যে পাপ, তাও বলা আছে। বর্ণাশ্রমের কথা সরাসরিভাবে না থাকলেও তিনি চাইতেন না যে, কেউ তার ব্যক্তিগত বা বংশগত বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করে যেমন খুশি তেমনভাবে চলে, যা খুশি তাই করে। তাই আমার মনে হয় তিনি in essence (তত্ত্বতঃ) বর্ণাশ্রম মানতেন। .....আমি স্বভাবতঃই ভাবি, মানুষের দরদী বান্ধব মহামঙ্গলদাতা রসুল কখনও বর্ণাশ্রমের বিরোধী হতে পারেন না। আমি তো লেখাপড়া জানি না, তা না হলে মূল কোরাণ ও হাদিস ঘেঁটে অকাট্যভাবে প্রমাণ দেখিয়ে দিতে পারতাম যে, বর্ণাশ্রমের মূলগত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রসুলের বিন্দুমাত্র দ্বিমত নেই।

আ. প্র. ১২/১২.৭.১৯৪৮

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—অবতারপুরুষ যে-বর্ণের মধ্যে আবির্ভূত হন সেই বর্ণের বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে অনেকখানি দেখা যায়। যেমন রাম, কৃষ্ণ এঁদের জীবনে ক্ষাত্র দিকটার প্রকাশ দেখতে পাই। রসুল ও খ্রীষ্টকে কোন্ বর্ণ ধরা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা জিনিস আছে যাকে বলা যায় অপকৃষ্ট (ill-cultured) আর একটা জিনিস আছে যাকে বলা যায় উৎকৃষ্ট (well-cultured). উন্নত সুপবিত্র আত্মা আসতে গেলে তার জন্য উপযুক্ত সমাবেশ দরকার, যাতে তাঁকে ধারণ করতে পারে ও পোষণ দিতে পারে। Biologically (জৈবগতভাবে) well-cultured (উৎকৃষ্ট) হওয়া চাই, নচেৎ উৎকৃষ্টের আবির্ভাব হয় না। তিনি তো বিধি-বিসৃষ্ট হবেন, জন্মাতে গেলে জন্মানর বিধান অনুযায়ীই জন্মাতে হবে। তাই তিনি সব বর্ণের মধ্য-দিয়েই আসতে পারেন, কিন্তু বংশ উৎকৃষ্ট, পবিত্র, উন্নত ও সৎ হওয়া চাই।

প্রশ্ন—রাম এবং কৃষ্ণের মধ্যে ক্ষাত্রভাবের পরিচয় পাই, কিন্তু বুদ্ধদেবের মধ্যে তা কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর activity (কাজ) লক্ষ্য করলে হয়, তিনি কিন্তু হিংসাকে resist (নিরোধ) করলেন। চৈতন্যদেব দেখিয়েছেন love (প্রেম)। রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে পাই জ্ঞান ভক্তি। যখন যেমন দরকার।

প্রশ্ন—রসুল ও খ্রীষ্ট কোন বর্ণ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় যীশু ও মহম্মদ একই বংশের। রসুল যদি কোরেশ বংশ-সম্ভূত হন, এবং কোরেশ-বংশ যদি বামুন হয়, তবে যীশুও বামুন।.... (আমার) দেওয়া আছে—কী দেখে মানুষের বর্ণ ঠিক করা যায়, লিখে নেবেন।....

প্রশ্নকর্ত্তা—রসুল যেমনভাবে একটা জিনিস সৃষ্টি করে দিয়ে গেলেন আটঘাট বেঁধে, যার প্রভাব আজও পর্য্যন্ত চলছে, কিন্তু অনেক মহাপুরুষের বেলায় তো অমন দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রসুল ধর্ম্মসংস্থাপন করলেন, সমাজ গঠন করে গেলেন, আর এই যে করলেন, এটা কিন্তু universal basis-এ (সার্ব্বজনীন ভিত্তিতে)। তিনি যা করে গেছেন তা সবার মঙ্গলের জন্য। তিনি শুধু মুসলমানদের জন্য এ-কথা ভাবলে আমরা বঞ্চিত হব। প্রত্যেক মহাপুরুষই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ এবং সমগ্র মানবসমাজের প্রকৃত কল্যাণই তাঁদের লক্ষ্য। তবে যখন যেমনভাবে পরিবেষণ করার তাই করেন। রামকৃষ্ণদেব, চৈতন্যদেব প্রভৃতি গ্লানি মুক্ত করে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেলেন, সমাজের কাঠামো তো তখন অনেকখানি ঠিকই ছিল, তাই ও বিষয়ে অতোখানি বলার প্রয়োজন হয়নি। আর, জ্ঞান-ভক্তি-ভালবাসার পথে চললে সব চলাই আপসে আপ ঠিক হতে থাকে।

একজন বললেন—গ্লানি তো রয়েই যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখনকার মত গ্লানি কমে, আবার বাড়ে, আবার তিনি আসেন। রসুল দেখেন কতখানি করলেন। বেদুইন প্রভৃতি কত-কত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করলেন। তাদের মধ্যে একটা culture (কৃষ্টি) দিলেন, একটা society (সমাজ) সৃষ্টি করলেন। ঐ দেশ-কাল-পাত্র-অনুযায়ী যা করলেন তা কিন্তু আর্য্যধারা থেকে মূলতঃ আলাদা নয়। আমরাই ভেবেছি আলাদা করে, তিনি তা করেননি। শুনেছি, খাদিজার কাকা না কে একজন খ্রীষ্টান ছিলেন। Praci 'ly (বাস্তবতঃ) তিনিই নাকি pivot (ভিত)। তিনিই inspiration

(প্রেরণা) জুগিয়েছেন রসুলকে। আজও দেখলে বোঝা যাবে ফারাক নেই—সুন্নৎ যারা করে অর্থাৎ তাঁর বলা ও করা অনুসরণ করে যারা চলে, তারা ও সকল ধার্ম্মিকরাই এক।

আ. প্র. ১৩/১৮.৭.১৯৪৮

কথাপ্রসঙ্গে একজন বললেন—হজরতের গুরু কেউ আছেন কিনা তা তো জানা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় খাদিজা বিবির কাকা সেই খ্রীষ্টানকেই গুরু বলা যায়। সবাই হয়তো এটা না মানতে পারে।

উক্ত দাদা—কোরাণে বিশ্বাসের কথা পাওয়া যায়, কিন্তু ভালবাসার কথা তেমন দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশ্বাস ও ভালবাসা, belief বা faith (বিশ্বাস) ও love (ভালবাসা) বোধহয় একই রকম root (ধাতু) থেকে। আমার মনে হয় belief মানে to be in life (জীবনে থাকা), to be in love (ভালবাসায় থাকা)। এটা আমার কথা।

আ. প্র. ১৩/৩১.৭.১৯৪৮

কথাপ্রসঙ্গে একজন বললেন—কোরাণে পূর্ব্বতনকে মানার সম্বন্ধে এত কথা থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা হজরত রসুলের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী যীশুখ্রীষ্টকেই মানে না। তাঁর ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে তাদের মস্ত বিরোধ। তারা বলে—তা হলে আল্লার শরিক করা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা তো নয়। একেরই তিনটে aspect (দিক), যেমন আলোর দুটো aspect (দিক)—heat ও light (তাপ ও আলো)।

আ. প্র. ১৩/১.৮.১৯৪৮

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার ভাল লাগে প্রত্যেকটি প্রেরিতপুরুষকে; তিনি যিনিই হউন, সকলেরই এক সুর। হাদিস এনেছিল, দেখে মনে হল যেন ক্রাইষ্টের কথা নকল করা, অবশ্য হাদিসে হাদিসের মতো করে বলা। তাঁরা পরিবেষণ করেছেন দেশকালপাত্রানুযায়ী প্রয়োজন বুঝে। ভগবান নিজে unit (একক), তিনি ভালবাসেন ঐক্য, একতা, integrated (সংহত) হওয়া একে—ভগবানে—আমরা তা করলাম না—উল্টো করলাম—

ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন দল বাঁধলাম। আমরা যে-কোন Prophet-এর (প্রেরিতপুরুষের) কথা বলতে গিয়ে তাঁর পরবর্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তীর কথা যদি না বলি, তবে অন্যায় হবে। Same thing (একই জিনিস), same rhythm (একই ছন্দ)। ক্রাইষ্ট বিবাহ-বিচ্ছেদকে কত করে নিষেধ করলেন। এমনতর পর্য্যন্ত বললেন, স্বামী-পরিত্যক্তা নারীকে বিবাহ করা ব্যভিচারের সামিল। আমরা সেই জিনিসই প্রবর্ত্তন করলাম। কেন করলাম। আমরা খেয়ালকে প্রাধান্য দিয়ে চলি। আমরা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টানরা যদি এভাবে চলি, নষ্ট হব ও নষ্ট করব দুনিয়াকে। আমরা যখন ক্রাইষ্টকে ভক্তি করলাম, এটা যেন মনে থাকে, তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী যাঁরা তাঁতে কেন্দ্রীভূত ও জাগ্রত, তাঁদের সবাইকেই ভক্তি করলাম একযোগে। যে-কোন Prophet (প্রেরিতপুরুষ) সম্বন্ধেই এই কথা।.... ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য প্রয়োজনমতো যুগে-যুগে তাঁর আবির্ভাব হয়। তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই বুদ্ধ, তিনিই ক্রাইষ্ট, তিনিই রামকৃষ্ণ। প্রেরিতপুরুষ রসুলও তিনিই।

আ. প্র. ১৪/১৩.১০.১৯৪৮

লক্ষ্ণৌ-এর একটি মা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—লক্ষ্ণৌ-এর এক কলেজে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান উপলক্ষে রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতির নামের উল্লেখে মুসলমান সম্প্রদায়ের তরফ থেকে আপত্তি ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনিই সব হয়ে এসেছেন বিভিন্ন সময়ে। খোদার বান্দাকে যদি অস্বীকার করি, তাঁকেই অস্বীকার করা হয়। তোমার একটি সন্তানকে যদি তোমার সন্তান বলতে অস্বীকার করে, তাহলে কি তোমাকেই অপমান করা হয় না? সর্ব্ব সম্প্রদায়ের ঐক্য সম্বন্ধেও রসুলের বহু বহু কথা বলা আছে। সেগুলি সংগ্রহ করে রাখতে হয়। রসুলের জীবনী, কোরাণ, হাদিস, ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদি ভাল করে পড়ে রাখতে হয়। ইসলামের বিকৃতিকে আমাদের কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। তা যদি আমরা সুকৌশলে নিরোধ না করি, তাহলে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। ধর্ম্মকে নিয়ে কোথাও কোন বিরোধের কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না। ধর্ম্মের সম্প্রদায় লাখ হ'তে পারে, কিন্তু একজন বৈশিষ্ট্যপালী আপুরয়মাণ unit (এক) যদি থাকেন, তখন সবই ঐক্যে সমাবিষ্ট হয়। তখন দুনিয়ায় ভয় থাকে না, দুঃখ থাকে না, কষ্ট থাকে না। অবশ্য, শয়তান সবসময়ই তার কারসাজি চালাতে থাকে। বিভেদের বীজ সৃষ্টি করতে না পারলে যেন তার পেটের ভাত হজম হয় না।

আ. প্র. ১৭/৯.৫.১৯৪৯

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—হজরত রসুল যে সময় এসেছিলেন, তখন হিন্দুরা কি তাঁকে গ্রহণ করতে পারতেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা পারবেন না কেন? আমার মনে হয় পঞ্চবর্হি ও সপ্তার্চ্চির তাৎপর্য্য রসুলের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায়।

আ. প্র. ১৭/২২.৭.১৯৪৯

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষের ভাবানুকম্পিতা যদি কোথাও কেন্দ্রায়িত ও সংহত না হয় তা হলে সেই ফুটো দিয়ে অনেক কিছু বেরিয়ে যায়। জীবন্ত ইষ্ট হলে তো কথাই নেই। গুরুভক্তিকে অবলম্বন করে কোন মহাপুরুষের উপর নেশা যদি থাকে তাতেও অবাঞ্ছনীয় প্রবৃত্তি-প্রভাব থেকে অনেক বেঁচে যায়। দোষগুণ সত্ত্বেও মুসলমানদের ধর্ম্মনিষ্ঠা অনেকখানি জীবন্ত। ধর্ম্মপ্রাণতা না থাকলে পরস্পর সহযোগিতা থাকে না। কাছে গিয়ে দাঁড়াবার ভরসা হয় না যে আমার অমুক আছে। মুসলমান হিসাবে মুসলমানদের একটা বন্ধন আছে। ওড়িশাবাসীদের মধ্যে জগন্নাথদেবের উপর খুব ভক্তি আছে বলে শুনেছি। এসব জিনিস ভাল।

একজন বললেন—আমরা হয়ত গৌরাঙ্গদেবকে মানি, রামকৃষ্ণদেবকে মানি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের রীতি তো তা নয়। আমরা পূর্ব্ববর্ত্তীকে মানি এবং পরবর্ত্তী যিনি পূর্ব্ববর্ত্তীকে মানেন ও তাঁর পরিপূরণ করেন, তাঁকেও মানি।

অপর একজন বললেন—নচেৎ সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে পরস্পরবিরোধী নানা দলেরও সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের মধ্যে কত দল আছে, কিন্তু এক-এ কেন্দ্রায়িত বলে বহু দল থেকেও অনেকখানি এক। .....আমরা আবার জ্ঞানের কথা-টথা বেশী কই, অথচ আমরা জ্ঞাতসারে অনৈক্যবদ্ধ। আমরা ভাবি—আমরা খুব বুঝি। তাই জ্ঞানের কথা কইতে আমরা কম কই না। কিন্তু আমাদের সব ভাবা, সব বোঝা, সব করা fulfil (পরিপূরণ) করে একজনকে, এমন নেই।

আ. প্র. ১৮/২৪.৭.১৯৪৯

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—মুসলমানদের মধ্যে এত অসহিষ্ণু ভাব কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হজরতকে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দিল। তারপর তাঁর দুটো দাঁত

ভেঙ্গে দিল। কিন্তু তাঁর girdle (বেষ্টনী) খুব শক্তিমান ছিল। তারা রসুলকে বলতো, আমরা তোমার কথা শুনব কিন্তু যে বা যারা তোমার ক্ষতি করে তাদের ক্ষতি করবই। এমনি করে তারা প্রতিশোধ স্পৃহায় সংহত ও সংঘবদ্ধ হয়ে দশবছর পরে মক্কা জয় করল। তারপর এক-এক দেশ আক্রমণ করে জয় করতে লাগল। কিন্তু রসুল আর বেশীদিন বেঁচে রইলেন না।

যীশু তাঁর বেষ্টনীকে establish (প্রতিষ্ঠা)করলেন নিজের জীবনের বিনিময়ে। কিন্তু মহম্মদের girdle (বেষ্টনী) অনেক কষ্ট সহ্য করে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করে গেল এবং এইভাবে তারা নিজেরাও প্রতিষ্ঠিত হল।

আর্য্যঋষিরা মহম্মদকে ঋষি হিসাবেই গণ্য করেন— একেবারে অভিন্নভাবে। কিন্তু সাধারণ লোকে যে তাঁকে সেভাবে গ্রহণ করে না, সেটা একটা কাফেরী ব্যাপার। এক-একজন ঋষি বা মহাপুরুষ আসেন এবং তাঁকে কেন্দ্র ক'রে এক-একটা মননধারা-সমন্বিত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও মেনে নেয়। অক্সফোর্ড, লণ্ডন, কোলকাতা, দিল্লী ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী প্রায় সমান। ধর্ম্মজগতেও তেমনি প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত মুসলমান, প্রকৃত খ্রীষ্টান, প্রকৃত বৌদ্ধ—একই। এদের মধ্যে ফারাক কমই।

একজন বললেন—এক-এক বিশ্ববিদ্যালয় একটু বেশী ভাল না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক-এক বিষয়ে এক-আধটু বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে—এক-এক জায়গায়। ভাল হলে তার তদনুপাতিক কদরও আছে সর্ব্বত্র। তবে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. যদি যোগ্য হয়, তাহলে সে গিয়ে অক্সফোর্ডেও পড়াতে পারে।

ফলকথা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ হলে বুঝতে হবে কোথাও না কোথাও conceptual deficiency (বোধের খাঁকতি) আছে।

তথাকথিত মুসলমানরা রসুলকে যে অন্য মহাপুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখে এটা কিন্তু আদৌ রসুলের অভিপ্রেত নয়কো। রসুলের বিদায়-হজের উপদেশগুলি পড়ে দেখ, তাহলেই এর সত্যতা বুঝতে পারবে। মৌলানা আক্রাম খাঁর লেখা রসুলের জীবনী.....শুনে....মুগ্ধ হয়ে গেছি।

প্রশ্ন—রসুলের শিষ্যরা তো ভাল ছিল, তবে এমন হ'ল কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরে গোল করেছে, বিকৃতি ঢুকেছে।

আ. প্র. ১৮/১৪.১ ১৯৫০

একজন মুসলমান ভাই এসে নানা বিষয়ে জানতে চাইলেন। তার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রসুল যা বলে গেছেন তার সঙ্গে হিন্দুশাস্ত্রের কোন গরমিল নেই। একই কথা বিভিন্ন ভাষায় বলা। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের graduate (স্নাতক)-দের মধ্যে যেমন কোন তফাত নেই, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রাণ মানুষদের মধ্যেও তেমন কোন ফারাক নেই। সবাই একেরই পূজারী। তাই পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি যাতে হয়—তাই কর লক্ষ্মী। খেটেপিটে যদি শান্তি আনতে পারে তবে ইসলামের সেবা কিছুটা করা হয়। তোমার মতো সাধু প্রকৃতির মানুষরাই এটা করতে পারে। যদি পার তাই কর। তাতে রসুল খুশী হবেন। খোদাতালার আশীর্ব্বাদভাজন হবে তুমি। জানবে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ঈশ্বরেরই সত্তা বিদ্যমান। তাই প্রাণভরে তাদের সেবা করবে। ভক্তির সঙ্গে, ভালবাসার সঙ্গে তাদের আপন করে নেবে। ....

আ. প্র. ১৯/২৫.৩.১৯৫০

এক দাদা রসুলের সম্পর্কে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রেরিতদের মধ্যে বিভেদ নেই। ঈশ্বরও বহু নয়, ধর্ম্মও বহু নয়। সত্তাসম্বর্দ্ধনা ও মানবধর্ম্মের বিরোধী কোন কথা কোন অবতার মহাপুরুষ বলেননি। ঐ-সব কথা যারা বলে তারা জীবনের পূজারী নয়, মৃত্যুর পূজারী। এককথায়, শয়তানের সাকরেদ তারা।

আ.প্র. ১৯/১.৪.১৯৫০

একটি ভাই জিজ্ঞাসা করলেন—হজরত মহম্মদ কি উপলব্ধিবান পুরুষ ছিলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা না হলে সে-সব বিষয়ে বললেন কী করে?

উক্ত ভাই—রসুল তো জন্মান্তর মানেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি হয়তো মানতেন। কোরাণে পাওয়া যায়, আমি ঘাস ছিলাম, কত কী ছিলাম....ইত্যাদি ধরনের কথা। মহাপুরুষদের কথায় কোন বিরোধ নেই। তাঁরা বিভিন্ন ভাষায় মূলতঃ এক কথা বলেছেন। অবশ্য, এক-এক সময় যুগপ্রয়োজন-অনুযায়ী এক-এক কথার উপর জোর দিয়েছেন।

আ.প্র. ২০/৩০.১.১৯৫১

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রসুলের প্রতি আমার খুব একটা টান আছে। তাঁর দয়াতেই এটা হয়েছে। কিছু সংখ্যক মুসলমানের বিরূপ ব্যবহার সত্ত্বেও আমার রসুলের প্রতি টান কিছুতেই কমে না।

একজন বললেন—একবার আপনি এক মৌলবী সাহেবের কাছে রসুলের চেহারার বর্ণনাও তো দিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর চুপ করে রইলেন।

আ. প্র. ২০/১৫.৬.১৯৫১

একটি মুসলমান ভাই এসে বললেন—আমি জীবনে অনেক অন্যায় করেছি, মুক্তি পাব কেমন করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানের দিকে মন দাও, খোদাকে ডাক; রসুলকে ভালবাস, রসুলকে ভালবাসতে হলে সব রসুলকেই ভালবাসা লাগে।

আ. প্র. ২১/২৩.৪.১৯৫২

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রসুল বলেছেন, মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাঁরা যা বলেছেন যদিও তা অকাট্য সত্য, তবুও ইচ্ছা করে বলি, 'তোমরা দয়া কর, তোমাদের দয়ায় মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন হোক।'

আ.প্র. ২১/৭.৬.১৯৫২

মুসলমানদের কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রসুলরূপী একাদর্শের অনুসরণের ভিতর দিয়ে ওদের ভিতর ঐক্যের ভিত গড়ে উঠেছে। আমরা যদি ধর্ম্ম ও কৃষ্টির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হই, তাহ'লে আমাদের উন্নতি অবধারিত। আমরা বুঝি না যে, পরবর্ত্তীর মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী সবাই আছেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই যে রাম, তা আমরা বুঝি না। তাই অযথা বিরোধের সৃষ্টি হয়। প্রকৃত আদর্শপ্রাণতা যদি জাগ্রত থাকে, তাহলেই সব অবস্থার মধ্যে একটা পথ থাকে, সংহতি বজায় থাকে। মুসলমানরা সংযত যতখানি হোক বা না হোক, সংহত অনেকখানি।

আ.প্র. ২২/১৯.১২.১৯৫৩

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ইসলাম হল স্‌লাম থেকে। সেলাম বলে নমস্কার করে। ইসলাম কথার মানে হল আত্মনিবেদন। ধর্ম্ম এক, ঈশ্বর এক,

প্রেরিতগণ একই বার্ত্তাবাহী। খোদা যেমন বহু হয় না, তেমনি ধর্ম্মও বহু হয় না। কোরাণে আছে, জীবের রক্তমাংস খোদার কাছে পৌঁছায় না। সেইজন্য মাছ-মাংস খাওয়াই ঠিক না। এখন দেখি, ইসলামপন্থী বলে যারা পরিচয় দেয় তাদের অনেকেই ঠিক-ঠিক ইসলামের বিধিগুলি অনুসরণ করে না।

দীর. ২/২৬.৭.১৯৫৬

একজন কথাপ্রসঙ্গে বললেন—হজরত রসুল আল্লাকে worship (পূজা) করার কথা বলেছেন। 'আমাকে পূজা কর'—তা বলেননি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যদি তাঁকে ভালবাস, you should love His everything (তাঁর সব কিছুকেই তোমার ভালবাসা উচিত)। ভালবাসলে এই হয়। আল্লাকে যে ভালবাসবে সে আল্লার রসুলকেও ভালবাসবে। তুমি আমাকে ভালবাস; আমার এই চাদরটাকে কি ফেলে দেবে? আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমার গেঞ্জিটাকে কি আমি ফেলে দেব?

উক্ত দাদা—তাহলে তো Living Ideal absolutely necessary (জীবন্ত আদর্শ নিতান্তই প্রয়োজনীয়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Living Ideal (জীবন্ত আদর্শ) হ'লে সুবিধা হয়। আমরা attribute-এর (গুণের) expression (প্রকাশ) ধরে চলতে চাই। গুণের আধিপত্যের ভিতর-দিয়ে চলতে-চলতে চলনাগুলি সহজ হয়ে ওঠে। নতুবা শূন্যে ধ্যান করা লাগে।

উক্ত দাদা—হজরত রসুল শুধু আল্লার কথাই বলে গেছেন—love Him (তাঁকে ভালবাস)। নিজের কথা বলেনইনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সকলেই তাই বলে। আমি তোমাকে ভালবাসি, মানে তোমার Him-কেও (তাঁকেও) ভালবাসি। তোমাকে ভালবাসলে তাঁকেও ভালবাসি। এই হল সোজা কথা।

দীর. ২/৮.১২.১৯৫৬

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বেষ্টনী ভাল না থাকলে হয় না। সব চাইতে ভাল বেষ্টনী ছিল হজরত রসুলের। বুদ্ধদেবেরও ভাল বেষ্টনী ছিল। চৈতন্যদেবেরও ভাল বেষ্টনী ছিল। সব চাইতে খারাপ বেষ্টনী ছিল Jesus-এর (যীশুর)।

দীর. ৩/১.৯.১৯৫৭

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হজরত রসুল work (কাজ) করেছিলেন tribal area-র (আদিবাসী অঞ্চলের) মধ্যে। তারা নাকি কাঁচা মাংস খেত, মাকেও বিয়ে করত। কিন্তু Christ (খ্রীষ্ট) work (কাজ) করেছিলেন civil people-এর (সভ্য সমাজের) মধ্যে।

একটি ভাই বলল—মুসলমানরা বলে বকরিদে পশু বলি না দিলে আল্লা তুষ্ট হন না।

দৃপ্ত তেজে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মিথ্যা কথা। তাহলে আর রসুল ওকথা লেখেন কী করে—জীবের রক্তমাংস আল্লার দরবারে পৌঁছায় না? তোমার ছেলেমেয়েকে বলি দিলে কি তোমার মা খুশি হয়? আর, নিজের ছাওয়ালকে যে খায় সে মা রাক্ষসী মা। ঐ যে শ্মশানকালী দেখিসনি? এই রকম—বলে চোখমুখ ভয়ঙ্কর করে, বড় করে জিভ বের করে এক দারুণ চেহারা দেখালেন ঠাকুর। তারপর আবার স্বাভাবিক হয়ে শান্ত স্বরে বলছেন—মা সবারই। একটা গরুরও মা, একটা ছাগলেরও মা, একটা হাতীরও মা, ঐ পোকাটারও মা।

দীর. ৫/২৭.৮.১৯৫৯

হজরত রসুলের মেরাজ প্রসঙ্গে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মেরাজের বর্ণনায় আছে, হজরত রসুল খোদার সান্নিধ্য লাভ করলেন, তাঁতে merge করলেন না (তাঁর সাথে মিশে গেলেন না)। তিনি ঘোড়ায় চড়ে আসলেন, মানে সুরতকে অবলম্বন করে এগোলেন। সু—perfectly (নিখুঁতভাবে), রত মানে engaged (নিয়োজিত)। তাই সুরত মানে perfectly engaged in the affairs of Allah (আল্লার কর্ম্মে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত)। এই সুরতে চড়ে যেতে লাগলে (অনুভূতি লাভের পথে) চাঁদ দেখা যায়, আরো কত কী দেখা যায়! এই সুরতই যোগাবেগ—strong tendency of unification (যুক্ত হওয়ার প্রবল আকৃতি)।

দীর. ৫/১.১০.১৯৫৯

হজরত রসুলের মেরাজ নিয়ে কথা চলছিল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন— কাল স্বপ্ন দেখছিলাম, মেরাজ সম্বন্ধে আমি যেন কাকে জিজ্ঞাসা করছি। এই কদিন তো ঐ সব আলোচনাই হচ্ছে। স্বপ্ন সেইজন্যেই দেখেছি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, নারীমূর্ত্তি কেন? উত্তর পেলাম, সুরতই নারী, উদ্ভবই

নারী। নারী না থাকলে libido (সুরত) থাকত না। নারী-পুরুষের সঙ্গতির যে affinity (যোগাযোগ), libido (সুরত) সেখানে থাকে। মেরাজের বর্ণনায় আছে, তার চার পা এবং পাখা আছে। পাখার tendency (প্রবণতা) হল উড়ে যাওয়া। আর, চার পা মানে পঞ্চভূতের আর চার ভূত। Earth, air, fire, water (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ)-এর উপর দিয়েই সে roam (পরিভ্রমণ) করে।

দীর. ৫/১৫.১২.১৯৫৯

একজন আল্লা ও খোদা বলতে কী বোঝায় জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যে auto-initiative effulgence transformed into life (স্বতঃসম্বেগী দীপ্তি জীবনে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে), যে active energetic urge of being and becoming transformed into variety (জীবন-বৃদ্ধির যে সক্রিয় উদ্যমী সম্বেগ বৈচিত্র্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে), সেটাই তো উৎস, আল্লা। সম্বেগটাই transformed হয় into creation (সৃষ্ট পদার্থে রূপ পরিগ্রহ করে)। আল্লা মানেই হল সব যা কিছুকে যিনি গ্রহণ করেছেন। আবার, জীবন-সম্বেগের মূল উৎস যিনি তিনিই খোদা।

দীর. ৫/১৫.১২.১৯৫৯

মেরাজ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর দেওঘরের মৌলবী সাহেবকে বলছিলেন—ঘোড়ার চার পা মানে হল ক্ষিতির সুরত, অপের সুরত, তেজের সুরত, মরুতের সুরত। আর ঘোড়াটা নিজেই ব্যোম। ওর body-টাই (দেহটাই) ব্যোম। ঐ চারটি dwells in the dome of ব্যোম (ঐ চারটি ব্যোমের সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত)।...ঐ ঘোড়ার মুখ মনে হয় female-এর (স্ত্রীলোকের) মত ছিল। মানে যে energetic urge (উদ্যমী সম্বেগ) জগৎ প্রসব করেছে, ঐ মুখের significance (তাৎপর্য্য) তাই indicate (সূচিত) করে। তাই আমার ধারণা, মুখখানি ছিল কমনীয়, সুরতসম্বেগশালী।

দীর. ৫/১৬.১২.১৯৫৯

একজন জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, হজরত রসুল idolatry (পৌত্তলিকতা) একদম ভেঙ্গে দিলেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা করলেন কেন? তিনি দেখলেন, idolatry (পৌত্তলিকতা) -র মধ্যে attributal impulse (গুণগত সাড়া) পাওয়া যায় না। আবার, attribute (গুণ) পেলেই হবে না। Skill (কৌশল) বের করা লাগবে how to work it out (কিভাবে তা বাস্তবায়িত করে তোলা যায়)। আল্লার attributes (গুণাবলী) দেখলে তো আমরা puzzled (হতভম্ব) হয়ে যাব। আমাদের দেখতে হবে Prophet-এর attribute (প্রেরিতপুরুষের গুণাবলী)। সেগুলি আমরা ধরতে পারি, culture (অনুশীলন) করতে পারি। সেগুলির দ্বারা আমরা bedewed (অভিষিক্ত) হয়ে উঠতে পারি। Prophet (প্রেরিতপুরুষ) থেকে আমরা যে impulse (প্রেরণা) পাই তা আমাদের ভিতরে অনুশীলনী উর্জ্জনার সৃষ্টি করে। Idolatory (পৌত্তিলকতা) থেকে সে impulse (সাড়া) মেলে না। তাই, আল্লাকে ভালবাসতে গেলে তার রসুলকে ভালবাসতে হয়। রসুলকে যে ভালবাসে অথচ আল্লাকে ভালবাসে না, সে রসুলকে ভালবাসে না। আবার, যে আল্লাকে ভালবাসে অথচ রসুলকে ভালবাসে না, সে আল্লাকেও ভালবাসে না। তোমাদেরও আছে পূজার সময় দেবতার ধ্যান করতে হয়, মনন করতে হয়, তাঁর গুণাবলী চিন্তা করতে হয়। সেই সময় বাজনা বাজানো, থিয়েটার করা বা অন্যরকম স্ফূর্ত্তি করা, এসব ভাল না। রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলতেন—ধ্যান করবে মনে, বনে, কোণে। সেই সময় তাঁর attributes (গুণাবলী) চিন্তা করতে হয়, culture (অনুশীলন) করতে হয়। আমি সেদিন ডেকলাকে বলছিলাম, দেশে এত করে হনুমানের পূজা হয়, কিন্তু হনুমানের মত আর কেউ হয়ে ওঠে না। পূজো করে ফূর্ত্তি করে খাওয়া-দাওয়া করি। তাতে পেট তাতে, প্রাণ ভরে না। পেট ভরে বেঁচে থাকা যায়, প্রাণ না ভরলে বাড়া যায় না। দেখ, মুসলমানরা নামাজের সময় বাজনা বাজায় না। আজকাল mosque (মসজিদ)-এর কাছ থেকে প্রতিমাও নিতে দেয় না।.....

ওদের অনেকগুলি রকম দেখ হিন্দুর মত। এই যে হজরত রসুল indirectly (পরোক্ষভাবে) গরুর মাংস খাওয়া নিষেধ করেছেন। বললেন, গরুর দুধ পুষ্টিকর, কিন্তু মাংস অশেষ দোষের আকর। আবার বললেন, জীবের রক্তমাংস কখনও খোদার কাছে পৌছায় না। তারপর equal (সমান) ঘরে marriage-এর (বিবাহের) কথা বলেছেন। আজকাল ওরা মনে করে, মুসলমান হলেই বুঝি সবাই এক। কিন্তু খাঁটি মুসলমানরা তা মনে করে না। আরো আছে,

যে নিজের custom, tradition-কে (প্রথা, ঐতিহ্যকে) অবজ্ঞা করে অন্যেরটা গ্রহণ করে তার নরকেও জায়গা হয় না। সবাই ঘৃণা করে তাকে। তিনি আবার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ। কই, বৈশিষ্ট্যকে অবজ্ঞা করার কথা তো কোথাও বলে যাননি। তোমাদেরও আছে বিপ্রের একরকম, ক্ষত্রিয়ের একরকম, বৈশ্যের আরো একরকম ইত্যাদি। আবার Prophet-রা (প্রেরিতগণ) যে সকলেই এক, কারো সাথে কারো বিভেদ করো না, তাও তো বলে গেছেন। তাহলে difference (পার্থক্য) কোথায়? Custom-এর (আচরণের) মধ্যে difference (পার্থক্য) আছে।

অপর একজন বললেন—ওরা পয়গম্বরকে বলে খোদার প্রতিবিম্ব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো ভালই। তোমাদের পক্ষে সুবিধা। দোস্ত আছে কোরাণে। দোস্ত বললেই তো প্রতিবিম্ব হল।

উক্ত দাদা—কোরাণে ধর্ম্মান্তর নিষিদ্ধ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মান্তর কী? ধর্ম্মের অন্তর হয়ই না। ঐসব করতে যেয়েই তো tradition-গুলি (ঐতিহ্যগুলি) নষ্ট করে দেয়।

উক্ত দাদা—হজরত রসুলকে বলে শেষ নবী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তখনকার মত তো শেষই। কিন্তু একথা কি তিনি বলেছেন যে এর পরে আর আসবেন না?

প্রথম ব্যক্তি—তা বলেননি। ও ব্যাপারে silent (নীরব) রয়ে গেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যিনি যখনই আসেন, তিনি তখনকার মত শেষ নবী। তাঁর মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী সবাই জীবন্ত হয়ে থাকেন। তাই, last Prophet is the summation of all the past Prophets (সর্ব্বশেষ আগত যিনি, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেরিতগণের সমষ্টিজাত রূপ)। তোমাদেরও আছে, 'স পূর্ব্বেষাম অপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ'।

দীর. ৫/১৯.১২.১৯৫৯

—o—